লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৮ বর্ষ | ১১তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১ পৌষ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ | ৩ রবি: আউ:, ১৪৩৭ হিজরি | ১৫ ফাতাহ্, ১৩৯৪ হি. শা. | ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৫ ঈসাব্দ

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে
Love for All
Hatred for None

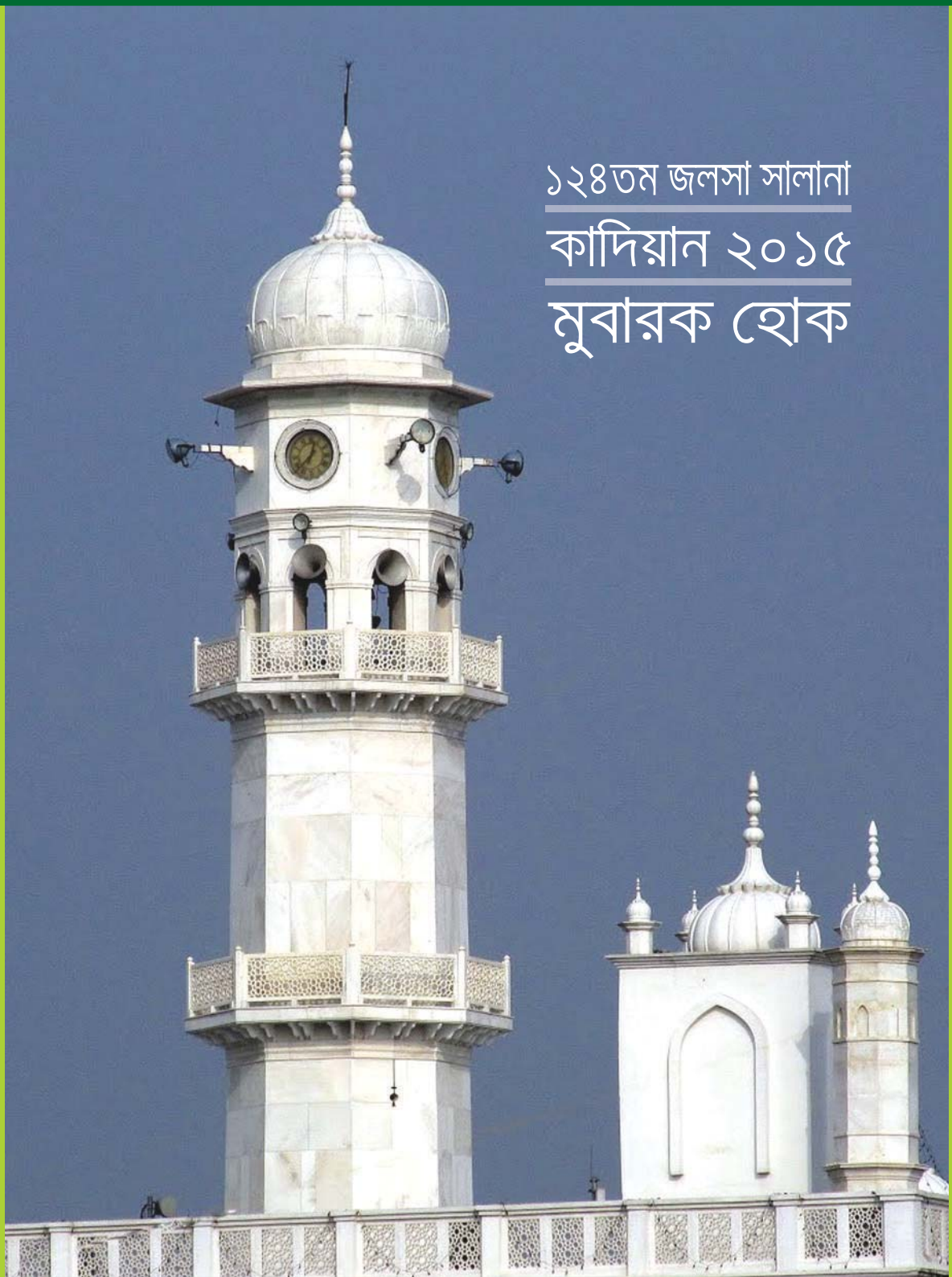

১২৪তম জলসা সালানা
কাদিয়ান ২০১৫
মুবারক হোক

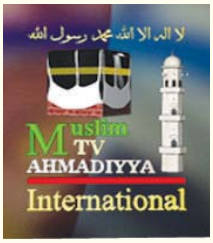

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৭১৬-২৫৩২১৬

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময় সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং রাত ৩.০০। (২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০। (৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০। (৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

কাদিয়ানের জলসা সালানা ২৬, ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। হুযূর (আই.) বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন থেকে জলসার সমাপ্তি বক্তব্য রাখবেন যা এমটিএ সরাসরি সম্প্রচার করবে বাংলাদেশ সময় ২৮ ডিসেম্বর বিকাল ৪ ঘটিকায়।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা **হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)** রচিত **'আল্ ইস্তিফতা'** পুস্তিকাটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহাদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৭১৬-২৫৩২১৬

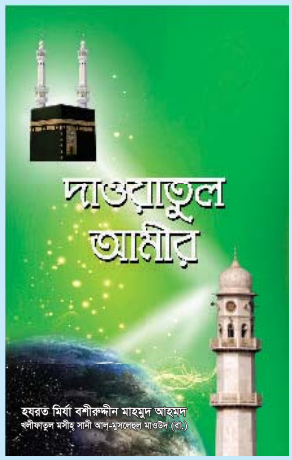

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) রচিত **'দাওয়াতুল আমীর'**-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

৩১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত বইটির **মূল্য ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৭১৬-২৫৩২১৬

"Love For All, Hatred For None."

Hakim Watertechnology

"Best Water, Best Life"

House hold/Official | Commercial/Industrial | Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

বাঙালি জাতির ইতিহাসে গৌরবোজ্জল ১৬ ডিসেম্বর

আবার ফিরে এসেছে বিজয়ের মাস ডিসেম্বর। বাঙালি জাতির গৌরবোজ্জল দিন ১৬ ডিসেম্বর- মহান বিজয় দিবস। ত্রিশ লক্ষ শহীদের আত্মদানে মুক্ত স্বদেশে আজ উদযাপিত হতে যাচ্ছে বিজয়ের ৪৪তম বার্ষিকী। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিকাল ৪টায় ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে হর্ষোৎফুল্ল এক বিশাল জনতার সামনে, আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষর করেন পাকিস্তান সরকার ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লে. জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী। পাকবাহিনীর এই আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষরদান মানেই তো যুদ্ধের বিজয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরাজয় এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের বিজয়ের স্মারক হিসেবে ১৯৭২ সাল থেকেই আমরা প্রতি বছর ১৬ ডিসেম্বর 'বিজয়' দিবস পালন করে আসছি। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে এরকম দ্বিতীয় আর কোন বিজয় দিবস নেই।

সমগ্র জাতি এই মাসে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অতুলনীয় সাহস ও আত্মত্যাগের কথা, দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে যারা পরাক্রমশালী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে স্বাধীনতার সূর্য পতাকা ছিনিয়ে এনেছিল। ঐ বিজয়ের পিছনে ছিল কোটি কোটি মানুষের দৃঢ় প্রত্যয় ও অকুণ্ঠ সমর্থন।

আজ আমাদের হৃদয় গর্বে ভরে যায়, পৃথিবীর সকল দেশের জনগণ প্রতি বছর আমাদের বিজয় দিবসকে স্মরণ করে। এ নদী বিধৌত পলি মাটির মনুষ্যত্ব আর গণতান্ত্রিক সমর্থনে সাধারণ মানুষ কতটা নিবেদিত প্রাণ ও দেশ প্রেমিক হতে পারে এবং কতটা আত্মত্যাগী হতে পারে তা বিশ্ববাসী উপলব্ধি করতে পারছে। ভাষা সৈনিক সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার এর আত্মদান আর একাত্তরের ৩০ লাখ শহীদ ও তিন লাখ মা বোনের ইজ্জত হারানো শাশ্বত এ বাঙ্গালীর রক্তের ধারাবাহিকতায় গড়ে উঠা বাংলাদেশ, আজ বিশ্ব-দরবারে স্বীয় মর্যাদায় মাথা উঁচু করে নিজ অস্তিত্বে দেদীপ্যমান। আমরা চাই যে লক্ষ্যে এদেশকে আমরা স্বাধীন করেছি তার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন। আজ সময়ের দাবী সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে শানিত করে সকল অন্ধকার শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই স্বাধীনতার মূল্যবোধকে সব কিছুর উর্ধ্বে তুলে ধরি। তবেই না আমাদের এই বিজয় দিবস পালন স্বার্থক হবে।

বিজয় দিবসের আনন্দ হোক চির অম্লান
জয় হোক চির সত্যের

সূচিপত্র

১৫ ডিসেম্বর, ২০১৫

কুরআন শরীফ	৩
হাদীস শরীফ	৪
অমৃত বাণী	৫
'বারাহীনে আহমদীয়া' হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ	৬
লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৩ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখের **জুমুআর খুতবা**	৯
আল্ ইস্তিফতা (বিবেকের কাছে প্রশ্ন) হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)	১৬
লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৩ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখের **জুমুআর খুতবা**	১৯
ইযালা-এ-আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)	২৭
কলমের জিহাদ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান	২৯
যে অঙ্গিকার রক্ষা করে না তার ধর্ম নেই মাহমুদ আহমদ সুমন	৩২
ইসলামে জন্মদিন পালন মামুন-উর-রশীদ	৩৪
যীশুর প্রকৃত জন্ম তারিখ ও বড় দিন জাহিদুল ইসলাম শুভ	৩৭
আমার পিতার আহমদীয়াত গ্রহণ এনামুল হক রনি	৩৮
জ্ঞানার্জনের জন্য বই পড়া উত্তম মোহাম্মদ সালাউদ্দীন ঢালী	৪০
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি (নভেম্বর ২২, ২০১৫)	৪১
পাঠক কলাম- "ইসলামে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার।" আনোয়ারা বেগম, মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, ফারহানা মাহমুদ তন্বী	৪২
সংবাদ	৪৪
আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ	৪৬
বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক	৪৮

'পাক্ষিক আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন **'পাক্ষিক আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'পাক্ষিক আহমদী'** পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা আন্ নাহ্‌ল-১৬

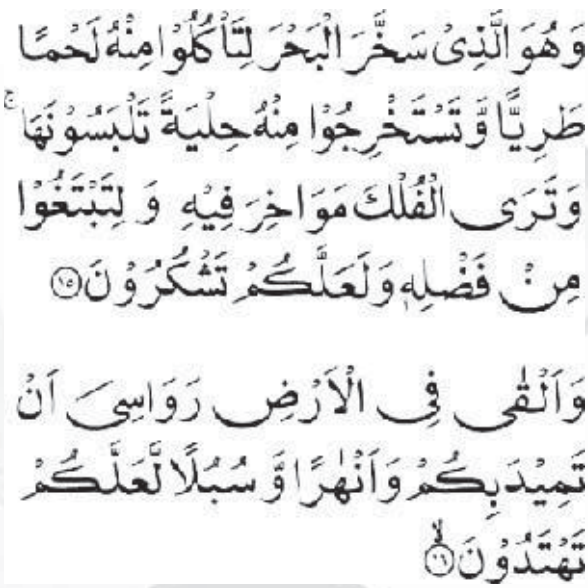
وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا
طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا
وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا
مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٥﴾

وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ
تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

১৫। আর তিনিই তোমাদের সেবায় সাগরকে নিয়োজিত করেছেন যেন তোমরা এ থেকে টাটকা মাংস খেতে পার এবং এ থেকে এমন সৌন্দর্য সামগ্রী বের করে আন যা তোমরা পরিধান কর। আর তুমি এতে নৌযানগুলোকে পানির বুক চিরে এগুতে দেখ যেন (এতে আরোহণ করে) তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান[১৫৩৬] কর এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

*১৬। আর তোমাদের জন্য খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ[১৫৩৭] করতে তিনি ভূ-পৃষ্ঠে সুদৃঢ় পাহাড়পর্বত স্থাপন করেছেন এবং নদনদী ও পথঘাট (সৃষ্টি করেছেন)[১৫৩৮] যাতে তোমরা সঠিক পথে চলতে পার।

১৫৩৬। মানবজাতির জন্য পার্থিব সুবিধা ও উপকারার্থে সমুদ্র এক অতি গুরুত্বপূর্ণ আবশ্যকীয় উৎস। সমুদ্র হলো বিশাল জলভান্ডার যেখান থেকে সূর্য আমাদেরকে বৃষ্টির যোগান দেয়। সমুদ্র যাতায়াত এবং বাণিজ্যের জন্য এবং মানুষের খাদ্যের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস্।

১৫৩৭। * [অনেক পন্ডিত 'আন তামিদা বিকুম' শব্দসমষ্টি থেকে ভূমিকম্প অর্থ বের করেছেন। একথা মেনে নিলে এর অর্থ দাঁড়াবে সর্বগ্রাসী ধ্বংসের উদ্দেশ্যে পাহাড় পর্বত সৃষ্টির কথা আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন! এটা কি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের নমুনা? দুর্ভাগ্যবশত 'তামিদা' শব্দটি যে 'মাদা' ধাতু থেকে নির্গত-একথটি অগ্রাহ্য করা হয়েছে। 'মাদা' শব্দের অর্থ হলো খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করা। পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত 'মায়েদা' শব্দটি একই ধাতু থেকে নির্গত। এ অর্থ গ্রহণ করার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটির অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে। আর এ আয়াতের এ অর্থটি মানবজাতিকে স্মরণ করায় যে, সব প্রাণীজগতকে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহের জন্য আল্লাহ্ পাহাড়পর্বতকে অপরিহার্য করে সৃষ্টি করেছেন। হ্রদ, সাগর, মহাসাগর প্রভৃতি প্রতিনিয়ত বাষ্পীয়করণের মাধ্যমে পানি ওপরে তুলছে পরবর্তীতে এ সূক্ষ্ম জলীয় বাষ্পকে ঘনীভূত রূপ দেয়ার জন্য একে আরও উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া হয়। এ জলীয়বাষ্পকে পুনরায় পানিতে রূপান্তরিত করার জন্য পাহাড়পর্বতের ভূমিকা অপরিহার্য। এ প্রক্রিয়ায় জলীয়বাষ্প ভারী মেঘে রূপান্তরিত হয়ে ভারী বর্ষণের কারণ হয়। আর এ বৃষ্টি ধারা পৃথিবীতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের মূল উপকরণ হিসেবে কাজ করে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে একমাত্র এ অনুবাদটিই সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়। আয়াতের অবশিষ্টাংশের সাথেও এ অনুবাদটিই সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই এ সূরা ১৬ নম্বর আয়াতে কৃত অনুবাদটিই গ্রহণযোগ্য।

পানি ও খাদ্য পরস্পর ওতপোতভাবে জড়িত। মানবসভ্যতার ইতিহাসে নদনদী দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে যাতায়াতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আবার এসব নদনদীর পাড় দিয়েই রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হয়েছে।

১৫৩৮। এ স্থলে "সুবুলান" (অর্থ পথ) মানুষের তৈরী কৃত্রিম পথ বুঝায় না, বরং প্রাকৃতিক চলাচলের পথ বুঝায় যা নদনদী, উপত্যকা ও গিরিবর্তের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে এবং সবযুগে এগুলোই জনপথ বা রাজপথরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

হাদীস শরীফ

ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর সত্যতায় মহাকাশে প্রদর্শিত অবিস্মরণীয় নিদর্শন

কুরআন ঃ

'এবং চন্দ্র সূর্য উভয়কে (গ্রহণে) একত্র করা হবে' (সূরা ক্বিয়ামা : ১০)।

হাদীস ঃ

আমাদের মাহদীর সত্যতার দু'টি নিদর্শন আছে। আর যখন থেকে খোদা তা'লা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এ দু'টি নিদর্শন কারও জন্য প্রদর্শন করেন নি। এর মধ্যে একটি এই যে, প্রতিশ্রুত মাহদীর যুগে রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণের রাতগুলোর (১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ) প্রথম তারিখে গ্রহণ লাগবে। দ্বিতীয় নিদর্শন এই যে, এ রমযান মাসেই সূর্যগ্রহণের তারিখগুলোর (২৭, ২৮ ও ২৯) মাধ্যম তারিখে অর্থাৎ ২৮ তারিখে গ্রহণ লাগবে।

(সুনানে দারকুতনী, বাবু সিফাতে সালাতিল খুসূফে ওয়াল কুসূফে ওয়া যাহায়াতেহিমা, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৮, মুদ্রাকর আনসারী ছাপাখানা, দিল্লী)

হযরত মুহাম্মদ বিন আলী, হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাকের (রা.) নামে পরিচিত। তিনি হযরত ইমাম আলী যয়েনুল আবেদীন (রা.)-এর পুত্র এবং হযরত ইমাম হুসায়েন (রা.)-এর পৌত্র ছিলেন। হাদীসকে আল্লামা কুরতুবী তাযকিরাতে, আল্লামা জালাল উদ্দিন সাইউতী আল হাবী ও আল্লামা ইবনে হাজর হাশিমী আল্ কওলুল মুখতাসির এ বর্ণনা করেছেন। এতদ্ব্যতিরেকে কয়েকজন পূর্ববর্তী আলেমও বর্ণনা করেছেন। শিয়া পন্থী আলেমগণেরও এ হাদীস সম্বন্ধে ঐকমত্য রয়েছে (তফসীরে সাফী, প্রথম খণ্ড, তেহরান, ফিতার ফোরশী ইসলামীয়া, পৃষ্ঠা-৭৬৫)।

হাদীসের শব্দে আওওয়ালে লায়লাতিন-এর অর্থ এটা হতে পারে না যে, রমযানের প্রথম তারিখে গ্রহণ লাগবে। কেননা, প্রথম রাত্রে জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী গ্রহণ লাগতেই পারে না। দ্বিতীয়তঃ প্রথম রাত্রের চাঁদকে আরবীতে 'হেলাল' বলে। হাদীসে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে 'কমর' বলে (আল্ মুনজিদ নামক অভিধান দেখুন)।

১। চন্দ্র গ্রহণের নির্ধারিত তারিখগুলোর মধ্যে প্রথম রাত্রে অর্থাৎ ১৩ তারিখ রাত্রে গ্রহণ লাগবে।

২। সূর্য গ্রহণের নির্ধারিত দিনগুলোর মধ্যবর্তী দিনে অর্থাৎ ২৮ তারিখ দিনে গ্রহণ লাগবে।

৩। উভয় গ্রহণই একই রমযান মাসে সংঘটিত হবে।

৪। একজন মাহ্‌দীর দাবীদারের উপস্থিতিতে তাঁর সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ এ গ্রহণদ্বয় সংঘটিত হবে। [বিস্তারিত জানার জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ-ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর 'তোহ্‌ফা গোলড়াবিয়া' পুস্তকের ১৪২-১৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

জ্যোতির্শাস্ত্র পাঠে এবং গ্রহণের তারিখগুলো দৃষ্টে জানা যায় যে, রমযান মাসে পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টির সময় থেকে নিয়ে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কখনও এসব নির্ধারিত তারিখে এ ধরনের সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হয় নি যাতে কোন দাবীকারক স্বীয় সত্যতার নিদর্শন হিসেবে এগুলোকে উপস্থাপন করেছেন।

এমন ঘটনা ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দেই প্রথম সংঘটিত হয় যখন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলায়হেস সালাম মাহ্‌দীর দাবীদার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আর সে সময় তিনি ব্যতিরেকে অন্য কোন মাহ্‌দীর দাবীদার পৃথিবীতে উপস্থিত ছিলেন না। ১৮৯৪ সনের ২৩ মার্চ এ চন্দ্র গ্রহণের এবং ৬ এপ্রিল সূর্য গ্রহণের নিদর্শন পৃথিবীর পূর্ব গোলার্ধে দেখানো হয় (আযাদ, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৯৪ এবং মিলিটারী গেজেট, ৬ ডিসেম্বর ১৮৯৪ দ্রষ্টব্য)। এসব শর্তানুযায়ী পরবর্তী বছরও রমযান মাসেই দ্বিতীয়বার চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় আর পশ্চিম গোলার্ধের লোকেরা সেই দৃশ্য অবলোকন করে।

খোদা তা'লা স্বীয় কর্মকান্ড দ্বারা সাক্ষ্য দিলেন ও নির্ধারিত দিনে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ দ্বারা প্রমাণ করলেন যে,

১। আমাদের প্রিয় প্রভু ও নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য এবং চৌদ্দশ' বছর পূর্বে একজন নিরক্ষর ব্যক্তি অদৃশ্যের এমন সংবাদ নিজের পক্ষ হতে তৈরী করে বলতে পারেন না। এটা মহানবী (সা.)-এর সত্যতারও একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

২। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্বীয় দাবীতে নিষ্ঠাবান ও প্রকৃতই সেই মাহ্‌দী যাঁর সম্বন্ধে হযরত রাসূল করীম (সা.) সংবাদ দিয়েছিলেন। কেননা, কোন মিথ্যা মাহ্‌দী সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ লাগাতে পারে না। মহাকাশীয় বস্তুনিচয়ের ওপর ব্যক্তিবিশেষের কোন হাত নেই।

আলহাজ্জ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

অমৃতবাণী

সে ধর্ম ধর্ম নয়, যাতে সাধারণ সহানুভূতির শিক্ষা নেই সে মানুষ মানুষ নয়, যার মধ্যে সহানুভূতির গুণ নেই

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

শত শত মতভেদ থাকা সত্ত্বেও আমরা হিন্দুই হই আর মুসলমানই হই আমরা ঐ খোদার প্রতি বিশ্বাস আনার ক্ষেত্রে অংশীদার, যিনি পৃথিবীর স্রষ্টা ও অধিপতি।

হে আমার সর্বশক্তিমান খোদা! হে আমার প্রিয় পথ-প্রদর্শক! তুমি আমাকে সে পথ দেখাও, যে পথে নিষ্ঠাবান ও নির্মল হৃদয়ের লোকগণ তোমাকে পেয়ে থাকেন এবং আমাদেরকে ঐ সকল পথ হতে রক্ষা কর যার লক্ষ্য কেবল কামনা-বাসনা বা বিদ্বেষ, হিংসা বা পার্থিব লোভ-লালসা।

অতঃপর হে শ্রোতাগণ! শত শত মতভেদ থাকা সত্ত্বেও আমরা হিন্দুই হই আর মুসলমানই হই আমরা ঐ খোদার প্রতি শ্বিাস আনার ক্ষেত্রে অংশীদার, যিনি পৃথিবীর স্রষ্টা ও অধিপতি। এরূপেই আমরা মানুষ নাম ধারণের ক্ষেত্রেও অংশীদার, অর্থাৎ আমাদের সকলকেই মানুষ বলা হয়। তদ্রূপেই একই দেশের অধিবাসী হওয়ার দরুনও আমরা একে অন্যের প্রতিবেশী। তাই নির্মল হৃদয় ও শুভেচ্ছার সাথে আমাদের একে অন্যের বন্ধু হয়ে যাওয়া কর্তব্য। তাছাড়া ধর্মীয় ও পার্থিব বিপদাপদে একে অন্যের প্রতি সহানুভূতি দেখানো উচিত এবং এরূপ সহানুভূতি দেখানো উচিত যেন একে অন্যের দেহের অংশ হয়ে যাই।

হে স্বদেশবাসীগণ! সে ধর্ম ধর্ম নয়, যাতে সাধারণ সহানুভূতির শিক্ষা নেই এবং সে মানুষ মানুষ নয়, যার মধ্যে সহানুভূতির গুণ নেই। আমাদের খোদা কোন জাতির মধ্যে পার্থক্য করেন নি। উদাহরণস্বরূপ, যে সমস্ত মানবীয় শক্তি ও ক্ষমতা আর্যাবর্তের আদিম জাতিদেরকে দেয়া হয়েছিল, ঐ সমস্ত শক্তিই আরব, পারস্য, সিরিয়া, চীন ও জাপানের অধিবাসীদেরকে এবং ইউরোপ ও আমেরিকার জাতিগুলোকেও দেয়া হয়েছে। সকলে জন্য খোদার জমীন বিছানার কাজ করছে। সকলের জন্য তাঁর সূর্য, চন্দ্র ও আরো অনেক নক্ষত্র উজ্জ্বল প্রদীপের কাজ করছে এবং অন্যান্য সেবাও করছে। তাঁর সৃষ্ট জড়-প্রকৃতি, অর্থাৎ বায়ু, পানি, আগুন, মাটি এবং তেমনিভাবেই তাঁর সৃষ্ট অন্যান্য সকল বস্তু যথা শাক-সব্জি, ফল, ঔষধ ইত্যাদি থেকে সকল জাতি উপকৃত হচ্ছে। অতএব আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের এ সকল রীতি এ শিক্ষাই দিচ্ছে আমরাও যেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের প্রতি সৌজন্য ও সৌহার্দ্য দেখাই এবং অনুদার ও সঙ্কীর্ণমনা না হই।

বন্ধুগণ! নিশ্চয় জানবেন, যদি আমাদের দু'জাতির কোনও জাতি খোদার গুণের সম্মান না করে এবং নিজেদের আচার-আচরণ তাঁর পবিত্র গুণাবলীর বিপরীত গঠন করে তবে সেই জাতি শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা কেবল নেজেরাই ধ্বংস হবে না, বরং নিজেদের বংশধরকেও ধ্বংস করে দেবে। যখন থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে তখন থেকে সকল দেশের সাধু পুরুষগণ এ সাক্ষ্য দিয়ে আসছেন যে, খোদার গুণের অনুসরণকরী হওয়া মানুষের স্থায়িত্বের জন্য এক জীবন সুধা। খোদার সকল পবিত্র গুণের অনুসরণ মানুষের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সাথে জড়িত। এটাই শান্তির উৎস।

(পয়গামে সুলেহ্, বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ৫-৬)

‘বারাহীনে আহমদীয়া’

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

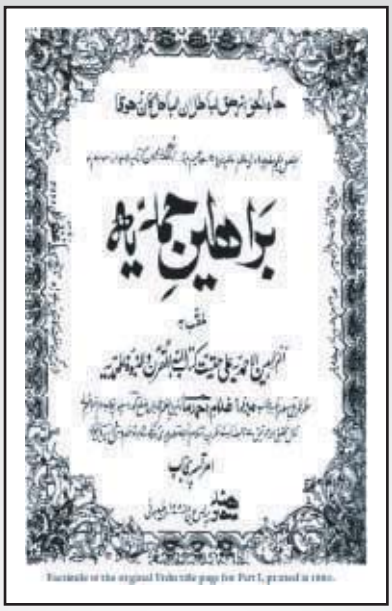

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

(৭ম কিস্তি)

স্মরণ রাখা উচিত, এর উত্তর তা-ই যা আমরা উপরে দিয়ে এসেছি। অর্থাৎ কোন যুগে রোগব্যাধির ব্যাপক প্রাদুর্ভাব হয়ে থাকে আর কোন যুগে কম, এক সময় তা একভাবে আর অন্য সময় ভিন্নভাবে বিস্তার লাভ করে। যে গ্রন্থের লেখক, সেই সকল ধ্যান-ধারণার অবসান চায়– তাকে দক্ষ চিকিৎসকের ন্যায় রোগের প্রকৃতি, ধরণ, পরিমান ও প্রকার ইত্যাদির নিরিখে নিজ প্রচেষ্টাকে যতটা ও যে পরিমান সম্ভব কার্যে রূপায়িত করা উচিত। যে মাত্রার ও যে ধরনের ব্যাধি দেখা দেয়, সংশোধনের ব্যবস্থাও অনুরূপ নেয়া উচিত যেন এর সুবাদে রোগের সর্বোত্তম ও সবচেয়ে সহজ চিকিৎসা সম্ভব হয়। কেননা কোন রচনায় যদি সম্বোধিত লোকদের অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা নেয়া না হয় তাহলে সেই রচনা অত্যন্ত অকেজো, অনুপকারী ও অকল্যাণকর হয়ে থাকে। এমন রচনার ভাষায় অস্বীকারকারীর স্বভাবের সাকুল্য চিত্র উদঘাটন করে তার মনের সকল সংশয় ও সন্দেহ নিরসনের মত বৈশিষ্ট্য আদৌ থাকে না। সুতরাং আমাদের বিরুদ্ধে আপত্তিকারীরা যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করে তাহলে তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এখন যত প্রকার ও যত ধরনের নৈরাজ্য স্বীয় আঁচল প্রসারিত করে রেখেছে এ সবের রূপ ও প্রকৃতি পূর্ববর্তী নৈরাজ্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর স্বল্পকাল পূর্বে যে যুগ অতিবাহিত হয়েছে তা ছিল অজ্ঞতামূলক অন্ধ অনুকরণের যুগ। এখন আমরা যে যুগ দেখছি তা যুক্তি-বুদ্ধির (আকল) অপপ্রয়োগের যুগ। ইতোপূর্বে অধিকাংশ মানুষকে পথহারা করে রেখেছিল অযৌক্তিক অন্ধ অনুকরণ। এখন চিন্তা-ভাবনা ও যুক্তির অযৌক্তিক ব্যবহার অনেককে লাঞ্ছনার মুখে ঠেলে দিয়েছে। এ কারণেই সুগভীর ও অকাট্য যেসকল যুক্তিপ্রমাণ আমাদের লিপিবদ্ধ করতে হয়েছে পূর্বের পুণ্যবান ও ধর্মপ্রাণ আলেমগণ এর মুখোমুখী হন নি। কেবল অন্ধ অনুকরণের প্রাধান্যকে দৃষ্টিতে রেখে যারা বই লিখেছিলেন। আমাদের যুগের নব্য আলো (ধ্বংস এমন আলোর জন্য) নব্য শিক্ষিতদের আধ্যাত্মিক শক্তিকে বিকল করে দিয়েছে। খোদার মহিমা কীর্তণের পরিবর্তে তাদের হৃদয়ে আত্মমহিমা শিকড় গেড়ে বসেছে। আল্লাহ্‌র হিদায়াত বা পথনির্দেশনাকে অবজ্ঞা করে নিজেরা হিদায়াত দাতা সেজে বসেছে। যদিও আজকাল নব্য-শিক্ষিতদের স্বাভাবিক আকর্ষণ কোন কিছুর যৌক্তিক ব্যাখ্যার প্রতি প্রবল, কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো বুদ্ধি ও জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার কারণে এ প্রবণতাই পথ প্রদর্শক না হয়ে সর্বস্বান্তকারী বা লুটেরা প্রমাণিত হচ্ছে। চিন্তাধারার বক্রতা মানুষের ধ্যাণধারণার প্রবাহে বড় বড়

ভুলভ্রান্তির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। বহুবিধ মতামত ও হরেক রকম চিন্তাভাবনার প্রসারের কারণে স্বল্পবুদ্ধির মানুষের সামনে বড় বড় সমস্যা মাথাচাড়া দিয়েছে। কূটতর্ক-ভিত্তিক যুক্তিবাদিতা নব্য শিক্ষিতদের স্বভাব ও অভ্যাসে বিভিন্ন প্রকার কুটিলতার জন্ম দিয়েছে। যে সকল বিষয় ছিল একান্ত যুক্তিপূর্ণ তা তাদের দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেছে। আর যে সকল কথা চরম অযৌক্তিক সেসবকে তারা অতি উন্নত মানের সত্য জ্ঞান করছে। যে সকল কাজ মানুষের উন্নতির অন্তরায় সেসবকে তারা সভ্যতা জ্ঞান করে বসে আছে আর সত্যিকার সভ্যতাকে তারা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। অতএব এমন সময়ে যারা নিজ গৃহেই গবেষক সেজে বসেছে আর আত্মপ্রশংসায় নিমগ্ন, তাদের চিকিৎসার জন্য আমরা কুরআনের সত্যতার সমর্থনে বারাহীনে আহমদীয়া গন্থ লিখেছি যা তিন শত নিশ্চিত যৌক্তিক প্রমাণ-সম্বলিত অথচ এর প্রতি তারা চরম অহংকারের সাথে অবজ্ঞা প্রদর্শন করছে। এটি একটি দেদীপ্যমান সত্য কথা যে, বুদ্ধি বা যুক্তির অপব্যবহারের কারণে যে বুদ্ধিহারা, যুক্তির মাধ্যমেই সে স্বস্তি পেতে পারে। যে উদ্ভট যুক্তির কারণে পথ হারিয়েছে সে সঠিক যুক্তির মাধ্যমেই সঠিক পথে ফিরে আসতে পারে।

যেই গ্রন্থের মাধ্যমে কুরআনের সত্যতার তিনশত যৌক্তিক প্রমাণ প্রচার করা হবে আর সকল বিরোধীর সন্দেহের নিরসন করা হবে, তা খোদার বান্দাদের যে কত বড় কল্যাণ সাধন করবে, এর প্রচারে ইসলামের যে কত অসাধারণ উন্নতি হবে আর এর মাহাত্ম্য ও সম্মান প্রতিষ্ঠিত হবে তা এখন প্রত্যেক মু'মিনের জন্য প্রণিধানযোগ্য বিষয়। বর্তমান যুগের অবস্থার প্রতি যারা ভ্রুক্ষেপ করে না আর বিরাজমান নৈরাজ্যের প্রতি যারা দৃকপাত করে না এবং পরিণতি সম্পর্কে ভাবে না বা যাদের ধর্মীয় বিষয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই এবং খোদা ও রসূলের প্রতি কোন ভালবাসা নেই, কেবল তারাই এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে।

হে প্রিয়গণ! এই গোলযোগপূর্ণ যুগে, ভ্রষ্টতার প্রবল তুফানের মুখে ধর্মের সত্যতার ঔজ্জ্বল্য প্রদর্শন এবং চতুর্দিক থেকে যে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হচ্ছে সুদৃঢ় ঐশী শক্তির বলে সেগুলো প্রতিহত করেই কেবল ধর্ম স্বীয় কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে। ধর্মের সত্যতার প্রমাণ যদি অজস্র ধারায় পৃথিবীর সামনে ঝলমল করে আর এর সত্যতার কিরণ চর্তুদিক হতে বিচ্ছুরিত হতে দেখা যায় কেবল তবেই যুগের চেহারায় যে গভীর অমানিশা বিরাজ করছে তা দূরীভূত হতে পারে। এই বিশৃংখল যুগে সেই ধর্মীয় গ্রন্থই আধ্যাত্মিক ঐক্য উপহার দিতে পারে যা গভীর গবেষণার মাধ্যমে পরম সত্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্য উন্মোচনে সক্ষম। অধিকন্তু যা সেই সত্যের স্থায়ী নিবাস পর্যন্ত পৌঁছায় যার জ্ঞান লাভের ওপর নির্ভর করে হৃদয়ের পরিতৃপ্তি ।

হে জ্যেষ্ঠগণ, এটি সে যুগ যখন কোন ব্যক্তি উন্নত যৌক্তিক প্রমাণাদি উপস্থাপন করা ছাড়া যদি নিজ ধর্মের সুরক্ষা চায় তবে তা হবে অসম্ভব ও অর্থহীন এক ধারণা। তোমরা নিজেরাই দেখছ কীভাবে মানব প্রকৃতি বিদ্রোহ-প্রবণ হয়ে উঠছে আর কীভাবে যুক্তি-বিজ্ঞানের প্রসার তাদের ধ্যাণ-ধারণার ওপর নানাপ্রকার নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে!

অধুনাকালের শিক্ষিত লোকদের হৃদয়ে এক অদ্ভুত ধরনের স্বাধীন মন-মানসিকতা দানা বাঁধছে। সরলতা, বিনয় ও হৃদয়ের পবিত্রতার মাঝে যে কল্যাণ নিহিত আছে তা সেসকল অহংকারী হৃদয় থেকে সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যায়। আর যে সকল ধ্যান–ধারণা তারা রপ্ত করে এর বেশীর ভাগ এমন যার ফলে তাদের হৃদয়ে ধর্মহীনতার কুমন্ত্রনা সৃষ্টিকারী প্রভাব পড়ে। তাদের অধিকাংশ সঠিক গবেষণার ক্ষেত্রে কোন বিশেষ মার্গে উপনীত হওয়ার পূর্বেই, বহুমুখী অহংকারের বশে দার্শনিক প্রকৃতির মানুষ সেজে বসে। এসো, মিথ্যার প্রতি আকৃষ্ট হবার পূর্বেই নিজের সন্তান-সন্ততি, স্বজাতি ও স্বদেশবাসীদের প্রতি করুণা কর। তাদের সত্য ও সততার প্রতি ফিরিয়ে আন যেন তোমাদের ও তোমাদের বংশের মঙ্গল হয় আর সবাই যেন বুঝতে পারে যে, ইসলাম ধর্মের সামনে অন্য সব ধর্ম অর্থহীন।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চেষ্টা-সাধনার ফলেই লক্ষ্য অর্জিত হয় আর এটিই পৃথিবীতে খোদার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম। যে ব্যক্তি হাত-পা গুটিয়ে উদাসীনতার ঘোরে অলস বসে থাকে, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সে বঞ্চিত ও হতভাগাই থেকে যায়।

সুতরাং আপনারাও যদি নিরঙ্কুশ সত্য ইসলাম ধর্মের সত্যতার প্রসার ও প্রচারের জন্য চেষ্টা করেন তাহলে খোদা সে প্রচেষ্টাকে বৃথা যেতে দেবেন না। ইসলামের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ খোদা আমাদের শতশত সুনিশ্চিত প্রমাণাদি প্রদান করেছেন কিন্তু আমাদের বিরোধীদের ভাগ্যে এর একটিও জোটেনি। খোদা আমাদের খাঁটি সত্য দিয়েছেন আর আমাদের বিরোধীরা মিথ্যার ওপরই ভাসছে। এক খোদার মাহাত্ম্য ও প্রতাপ প্রকাশের জন্য ধার্মিকদের হৃদয়ে এমন এক সত্যিকার ও আকূল উদ্দীপনা বিরাজ করে যার দূরতম কোন ধারণাও আমাদের বিরোধীদের নেই । কিন্তু তা সত্ত্বেও অহরাত্রির প্রচেষ্টা এমন এক কার্যকর বিষয় যে মিথ্যাপূজারীরাও তা থেকে উপকৃত হয় আর চোরের মত কোন না কোন স্থানে তাদের সিঁধ কাটা সফলতা বয়ে আনে অর্থাৎ তারাও এ হতে লাভবান হয়। খ্রিষ্টানদের ধর্মকে দেখ! বাহ্যিক দৃষ্টিতেও যাদের নীতি অর্থহীন, পাদ্রীদের অব্যাহত প্রচেষ্টার কারণে তা কত উন্নতি করছে আর কীভাবে তাদের পক্ষ থেকে প্রত্যেক বছর অহংকার-সূচক সংবাদ ছাপে যে, এবছর চার হাজার মানুষ খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে আর এবছর ৮ সহস্র মানুষ খোদাবন্দ মসীহ্‌র কৃপাধন্য হয়েছে! সম্প্রতি পাদ্রী হিকর সাহেব কলিকাতায় খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত খ্রিষ্টানদের যে চিত্র তুলে ধরেছেন এর মাধ্যমে অত্যন্ত দুঃখজনক একটি সংবাদের অবতারণা হয়।

পাদ্রী সাহেব বলেন, পঞ্চাশ বছর পূর্বে সমগ্র ভারতে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত লোকের সংখ্যা ছিল মাত্র সাতাশ হাজার। পঞ্চাশ বছরে যে কাজ হয়েছে তাহলো, খ্রিষ্টানদের সংখ্যা এখন সাতাস হাজার থেকে পাঁচ লক্ষে উপনীত হয়েছে। 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন'। সম্মানিত ভায়েরা! ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তি

প্রসারের এর চেয়ে ভয়াবহ সময় আর কোনটি হবে, যার পথ-পানে আপনারা চেয়ে আছেন? কোথায় এ যুগ! আর কোথায় এমন সময়ও ছিল যখন ইসলাম কুরআনের আয়াত 'ইয়াদখুলুনা ফিদিনিল্লাহে আফওয়াজা'-এর জীবন্ত প্রমাণ ছিল? এই সমস্যার কথা শুনে কি আপনাদের মন জ্বলে না? এই ভয়াবহ মহামারী দেখে কি আপনাদের হৃদয় উদ্বেলিত হয় না? হে বিবেকবান ও বিচক্ষণগণ! একথা বুঝা কঠিন কিছু নয় যে, যেই নৈরাজ্য ধর্মীয় বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে ছড়িয়েছে, ধর্মীয় জ্ঞানের প্রসারের ওপরই এর সূরাহা নির্ভর করে। এই লক্ষ্য পুরোপুরী বাস্তবায়নের জন্যই আমি 'বারাহীনে আহমদীয়া' পুস্তক রচনা করেছি আর এতে এমন ঘটা করে ইসলামের সত্যতার প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হয়েছে যার কল্যাণে নিত্যদিনের বিতন্ডার অবসান ঘটবে (ইসলামের) সুমহান বিজয়ের মাধ্যমে। এ গ্রন্থটি ছাপার জন্য আমরা যে সাহায্যের আহ্বান জানিয়েছি তা সম্পূর্ণভাবে মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে করেছি। কেননা যে গ্রন্থ ছাপতে সহস্র সহস্র রূপী ব্যয় হবে আর মুসলমানদের গণকল্যাণের উদ্দেশ্যে যার বিক্রয়মূল্য ২৫ রূপী থেকে কমিয়ে ১০ রূপী, অর্থাৎ অর্ধেকের চেয়েও কম নির্ধারণ করা হয়েছে, তা উদার মুসলমানদের অনুদান ছাড়া ছাপা কীভাবে সম্ভবপর হতে পারে?

কিছু মানুষের কান্ডজ্ঞান দেখে আক্ষেপ হয়, যারা আর্থিক সাহায্যের অনুরোধ করলে বলে, আমরা কেবল ছাপার পরই বই ক্রয় করবো–পূর্বে নয়। তাদের স্মরণ রাখা উচিত, এটি কোন বাণিজ্যিক বিষয় নয়। ধর্মের সমর্থন ও সহায়তা ছাড়া লেখকের অন্যের সম্পদে কোন আগ্রহ নেই। বই প্রকাশে যখন সমস্যা দেখা দেয় তখনই সাহায্যের সময়, নতুবা ছাপার পর সহায়তা, আরোগ্য লাভের পর রুগীকে ঔষধ খাওয়ানোর নামান্তর। সুতরাং এমন অর্থহীন সাহায্য করে কোন্ পুণ্যের আশা করা যেতে পারে? খোদা মানুষের হৃদয় থেকে ধর্মীয় ভালবাসা এমনভাবে তিরোহিত করেছেন যে, এরা নিজেদের নাম-সম্মানের জন্য চোখ বন্ধ করে সহস্র সহস্র রূপী উড়িয়ে দেয় কিন্তু এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনের মূল লক্ষ্য অর্থাৎ ধর্মীয় কাজে ব্যয়ের বিষয়ে দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনায় পড়ে যায়। খোদা ও আখেরাতে ঈমান রাখার মৌখীক দাবী করলেও সত্যিকার অর্থে তারা খোদা ও পরকাল– কোনটিতে বিশ্বাস রাখে না। তিলেক মাত্র যদি নিজেদের আর্থিক কুরবানীর মাত্রা ও মান বিশ্লেষণ করে দেখে যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতরাজির কতটা এক বছরে নিজেদের অবাধ্য প্রবৃত্তির স্থূলতার পিছনে উড়িয়ে দেয় আর কতটা শুধু খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মঙ্গল ও কল্যাণে ব্যয় করেছে; তাহলে নিজেদের অসাধু জীবনাচরণের জন্য নিজেরাই অশ্রু বিসর্জন দেবে। কিন্তু এ কথাগুলো নিয়ে ভাবার কে আছে? আর হৃদয়ে যে পর্দা রয়েছে তাই বা কীভাবে দূর হতে পারে?

وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ

অর্থাৎ আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন তার জন্য কোন হেদায়াত দাতা নেই। (সূরা রাদ: ৩৪)। এদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব ও জাগতিকতার মোহ দৃষ্টিতে রেখে আমাদের কিছু সম্মানিত বন্ধু, পরম ধর্মানুরাগ সত্ত্বেও মানবিক দুর্বলতার বশবর্তী হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে এ আপত্তি করে বসেছে যে, যেখানে মানুষের অবস্থা এমন, সেখানে এত বড় পুস্তক রচনা করা একটি অযথা কাজ, যার মুদ্রণে সহস্র সহস্র রূপী ব্যয় হতে পারে। অতএব তাদের সমীপে নিবেদন হলো, যদি আমরা সে সকল শত শত সূক্ষ্ম ও গূঢ় তত্ত্ব লিপিবদ্ধ না করতাম যা পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির মূল কারণ, তাহলে গ্রন্থ রচনা করাই অর্থহীন হয়ে যেতো। বাকী থাকল এই চিন্তা যে, এত রূপী কোত্থেকে-কীভাবে আসবে? এর উত্তরস্বরূপ বলছি যে, বন্ধুগণ! আমাদেরকে ভয় দেখাবেন না। নিশ্চিৎভাবে জেনে রাখুন, নিজেদের সম্পদে ভরা সিন্দুকে কৃপণদের যতটা না ভরসা থাকে –যার চাবি সবসময় তাদের পকেটে থাকে, নিরঙ্কুশ ক্ষমতাধর ও সর্বশক্তিমান খোদা –বদান্যশীল প্রভুর সত্ত্বায় এর চেয়ে বেশি ভরসা আমাদের রয়েছে। অতএব সেই সর্বশক্তিমান খোদা আপন ধর্ম, স্বীয় একত্ববাদ এবং নিজ বান্দার সমর্থনে নিজেই কাজ করবেন

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থাৎ তুমি কি জান না, নিশ্চয় আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান? (সূরা বাকারা: ১০৭)

সর্বক্ষণ সেই সর্বশক্তিমান খোদাই হলেন আমাদের আশ্রয়স্থল।

আমাদেরকে দুর্বল মানুষের কার্পণ্যের ভয় দেখাবেন না।

ছাপাখানা–
সফীরে হিন্দ, অমৃতসর

ভাষান্তর: **মওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বী সিলসিলাহ

নোট:

আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর রচিত পুস্তক 'বারাহীনে আহমদীয়া' এবং 'আল ইস্তিফ্‌তা' আহমদী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বাংলায় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, এই অনুবাদের ক্ষেত্রে যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় বা আরো উত্তম কোন শব্দ ব্যবহার করলে ভালো হবে বলে মনে করেন, সে ক্ষেত্রে আমাদের কাছে লিখে পাঠাতে পারেন এই ঠিকানায়-

পাক্ষিক আহমদী
৪, বকশী বাজার, রোড ঢাকা, ১২১১
মোবাইল: ০১৭১৬-২৫৩২১৬
masumon83@yahoo.com

জুমুআর খুতবা

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৩ই নভেম্বর, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল মৌলভী হেকীম নূর উদ্দীন সাহেব (রা.)-এর জীবনচরিত

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর যে ভালোবাসা এবং প্রেমের সম্পর্ক ছিল তা প্রত্যেক সেই আহমদী জানে যে তার সম্পর্কে কিছুটা পড়েছে বা শুনেছে। শুধু খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের প্রকৃত কোন দৃষ্টান্ত যদি দেয়া যায় তবে তাহলো হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল হাকীম নূরউদ্দীন (রা.)-এর দৃষ্টান্ত। আনুগত্যের অঙ্গীকার করার পর এর পরম উন্নত আদর্শ দেখিয়ে সেই আদর্শে প্রতিষ্ঠিত থাকার দৃষ্টান্ত যদি দেয়া যায় তবে তাহলো হযরত মওলানা নূরউদ্দীন (রা.)-এর দৃষ্টান্ত।

বয়আতের সুবাদে যে দায়িত্ব বর্তায় সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জাগতিক সকল

আত্মীয়তার বন্ধনের চেয়ে বেশি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে যদি কেউ দৃঢ় সম্পর্ক বন্ধন রচনা করে থাকেন তাহলে এর সবচেয়ে মহান দৃষ্টান্ত হলো, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর দৃষ্টান্ত। সেবক সুলভ অবস্থার অনন্য এবং অতুলনীয় দৃষ্টান্ত যদি কেউ স্থাপন করে থাকেন তাহলে তা সত্যিকার অর্থে হযরত হাকীমুল উম্মত মওলানা নূরউদ্দীন (রা.) করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সামনে বিনয়ের ক্ষেত্রে যদি কেউ পরম মার্গে উপনীত হিসেবে আমাদের চোখে পড়ে তাহলে জামাতে আহমদীয়াতের ইতিহাসে সেই উন্নত দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)। এছাড়া যুগ ইমাম হযরত আক্বদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে তিনি সেই সম্মান লাভ করেছেন যা অন্য কেউ লাভ করতে পারেনি। তিনি (আ.) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) সম্পর্কে বলেন, 'চে খুশ বূদে আগার হার ইয়াক্‌য্ উম্মাত নূরে দীঁ বূদে' অর্থাৎ কতইনা ভালো হতো যদি উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি নূরউদ্দীন হয়ে যেতো।

অতএব এটি এক অসাধারণ সাধুবাদ, অসাধারণ সম্মান যে যুগ ইমাম তাঁর অনুসারীদের জন্য সবকিছুর মানদন্ড হযরত মওলানা নূরউদ্দীনকে নির্ধারণ করেছেন অর্থাৎ সবাই যদি নূরউদ্দীন হয়ে যায় তাহলে এক বিপ্লব আসতে পারে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) হযরত হাকীম মওলানা নূরউদ্দীন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-র কিছু ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এসব ঘটনা পাঠ করে মনিব-ভৃত্য, পথপ্রদর্শক ও মুরীদ বা ভক্তের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং ভালোবাসার দৃষ্টান্ত সামনে আসে, বিনয়ের দৃষ্টান্ত দেখা যায়, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্তও চোখে পড়ে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর ত্যাগের মান এবং আনুগত্যের সুমহান দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, একবার তিনি কাদিয়ান এলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আপনার সম্পর্কে আমার ওপর ইলহাম হয়েছে, "যদি আপনি আপনার পৈত্রিক নিবাসে ফিরে যান তাহলে আপনার সম্মান হারাবেন।" এরপর তিনি (রা.) পৈত্রিক নিবাসে যাওয়ার নামটি পর্যন্ত উচ্চারণ করেন নি। তখন তিনি তার গ্রাম ভেরাতে এক জাঁকজমকপূর্ণ কোঠি বানাচ্ছিলেন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি যখন সেখানে যাই তখন আমিও সেই ঘর দেখেছি। সেখানে বসে দরস দেয়া এবং চিকিৎসা করার উদ্দেশ্যে তিনি অনেক বড় একটি হলঘর বানাচ্ছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, বর্তমান যুগের নিরিখে, অর্থাৎ যখন খলীফা সানী (রা.) একথা বর্ণনা করছেন, সেই ঘর আহামরি কিছু ছিল না কিন্তু যে যুগে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এই ত্যাগ স্বীকার করেছেন তখন জামাতের কাছে খুব বেশি সম্পদ ছিল না আর সে সময় এমন ঘর নির্মাণ করা সবার জন্য সম্ভবও ছিল না কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নির্দেশ শোনার পর তিনি (রা.) ফিরে গিয়ে এই ঘরের প্রতি তাকিয়েও দেখেন নি। যদিও কোন কোন বন্ধু বলেছিলেন, একবার গিয়ে এই ঘর দেখে আসুন কিন্তু তিনি (রা.) বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'লার জন্য সেই ঘর ছেড়ে দিয়েছি তাই এখন আমার আর এটি দেখার প্রয়োজন কি?

এরপর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। আঞ্জুমানের কতিপয় হর্তাকর্তা নিজেদের একমাত্র জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ভাবতে আরম্ভ করে আর জাগতিকতা তাদের ওপর ভর করে, তখন আঞ্জুমানে উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় সময় খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল এবং হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর মতামতের মিল থাকতো আর অন্যান্য বড় বড় নেত্রীস্থানীয় হর্তাকর্তার মতামত ভিন্ন হতো। যাহোক এমনই এক উপলক্ষে আঞ্জুমানে তা'লীমুল ইসলাম হাই স্কুল বন্ধ করা-সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এটি বন্ধ করার বিপক্ষে ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর মতামতও তাই ছিল, অর্থাৎ এটি বন্ধ করা সমীচীন হবে না।

এই ঘটনা নিয়ে চরম বিতর্ক চলছিল আর অবশেষে বিষয়টি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দরবারে পেশ হওয়ার ছিল। এ ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশায় কেউ কেউ এই স্কুলকে ভেঙ্গে শুধু আরবীর একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে ছিল কেননা দু'টো স্কুল চালানোর মতো সাধ্য জামাতের ছিল না। আর এই পক্ষের দল বেশ ভারী ছিল। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি মনে করি শুধু দেড় ব্যক্তিই স্কুলের পক্ষে ছিল, যাদের একজন ছিলেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) আর আমি নিজের সম্পর্কে বলি যে, অর্ধেক ছিলাম আমি, কারণ তখন আমি এক বালক ছিলাম।

কিন্তু আমি মনে করি তখন স্কুল সম্পর্কে যেই আবেগ এবং উচ্ছাস আমার ভেতর ছিল যা উন্মাদনার সীমায় উপনীত ছিল; আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) যেহেতু শ্রদ্ধাবোধের কারণে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সামনে বেশি কথা বলতে পারতেন না তাই তিনি আমাকে তার কথা পৌঁছানোর মাধ্যম বানিয়ে রেখেছিলেন। তিনি আমাকে তার মতামত জানিয়ে দিতেন আর আমি তা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে পৌঁছাতাম। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সাফল্য দান করেন। যদিও কোন কোন ত্বরাপরায়ণ বন্ধু আমাদের ওপর প্রায় কুফরী ফতওয়া আরোপ করার পর্যায়ে ছিল অর্থাৎ, এই স্কুল যদি বন্ধ না করা হয় তাহলে তোমরা কুফরী করছো এবং একথাও বলে যে, এরা দুনিয়াদার বা দুনিয়ার কীট।

খলীফা আউয়াল এবং মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সম্পর্কেও বলে, এরা দুনিয়াদার বা দুনিয়ার কীট কেননা, এরা ইংরেজী শিক্ষার সমর্থক কিন্তু তাসত্ত্বেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের পক্ষে রায় দেন। স্কুলের সাথে সংশ্লিষ্ট এই ঘটনার মাধ্যমে অর্থাৎ, স্কুল খোলা রাখা বা বন্ধ করে দেয়া সংক্রান্ত কথা একটি ভিন্ন বিষয় কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সামনে খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কথা বলার সময় যে ভদ্রতা এবং শিষ্টাচার ছিল তাও জানা যায়। হয়তো তিনি (রা.) একথাও ভেবে থাকবেন যে, কোন বিষয়

উপস্থাপনের সময় কোথাও এমন কথা মুখ থেকে বেরিয়ে না যায় যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সম্মান পরিপন্থী হতে পারে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর অন্তঃদৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে, তার ঈমানের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে জাতিগঠনের নীতির প্রেক্ষাপটে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, জাতি গঠিত হয় ব্যক্তির মাধ্যমে আর জাতির মাধ্যমে ব্যক্তি উন্নতি করে। উন্নত চিন্তা-ধারার মানুষ, বুদ্ধিমান এবং পুণ্যবান মানুষরা জাতির অনেক বেশি উপকার করে থাকে।

মহান এবং উন্নত উদ্দেশ্যাবলী যখন পুণ্যবান ও মেধাবী মানুষের হাতে আসে তখন তা অনেক বেশি উপকারী বা কল্যাণকর প্রমাণিত হয়। এরপর তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর সাথেও আল্লাহ্ তা'লা একই ব্যবহার করেছেন। তাঁর দাবির প্রারম্ভেই কতিপয় এমন ব্যক্তি তাঁর প্রতি ঈমান আনেন যারা ব্যক্তিগত যোগ্যতা এবং দক্ষতার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম সেবা প্রদানকারী ছিলেন। আর খোদা তা'লা যে দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত করেছেন সেই কাজে তাঁর সাহায্যকারী ও সহায়ক ছিলেন। তাদের মাঝে একজন ছিলেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমরা দেখেছি, সত্যিকার অর্থে তাঁরাই সর্বোত্তম সাহায্যকারী ও সহায়ক প্রমাণিত হয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নবুয়তের দাবি করার পূর্বেই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল হাকীম নূরউদ্দীন সাহেব (রা.)-র মনোযোগ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি নিবদ্ধ হয় আর তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তক-পুস্তিকা পাঠ করতে আরম্ভ করেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন মসীহ্ বা ঈসা হওয়ার দাবি করেন তখন নবুয়ত সংক্রান্ত কিছু বিষয়াদি তাঁর প্রারম্ভিক পুস্তিকা ফতেহ্ ইসলাম এবং তৌযীহে মারাম-এ বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি কুধারণা রাখতো, কোনভাবে এই দু'টো পুস্তিকার পান্ডুলিপি তার দৃষ্টিগোচর হয়। সেই ব্যক্তি জম্মু যায় এবং বলে, আজকে আমি মৌলভী নূরুদ্দীনকে মির্যা সাহেবের খপ্পর থেকে মুক্ত করব। তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে নিয়েছিলেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ঈসা হওয়ার দাবি করেছেন ফতেহ্ ইসলাম এবং তৌযীহে মারাম-এর ছাপার যুগে যা বয়আতের ঘটনার প্রায় দু'বছর পর হয়েছে। এই দু'টো পুস্তিকায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নবুয়তের ধারা যে অব্যাহত আছে তা যুক্তিপ্রমাণের আলোকে উল্লেখ করেন। সে ব্যক্তি তার পুস্তিকায় নবুয়তের ধারা অব্যাহত থাকা সংক্রান্ত বিষয় পাঠ করে বললো, এখন তো অবশ্যই মৌলভী নূরউদ্দীন মির্যা সাহেবকে পরিত্যাগ করবেন কেননা, মৌলভী নূরউদ্দীন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে গভীরভাবে ভালোবাসেন। তিনি যখন শুনবেন, মির্যা সাহেব বলেছেন, মহানবী (সা.)-এর পরও নবী আসতে পারেন তখন তিনি আর মির্যা সাহেবের মুরীদ বা ভক্ত থাকবেন না।

এই ব্যক্তি আরো কিছু লোক জড় করে আর হেলে-দুলে ধীরে ধীরে তাঁর (রা.) কাছে পৌঁছে। তাঁর কাছে পৌঁছে সে ব্যক্তি হযরত মৌলভী সাহেবকে বলে, আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। তিনি (রা.) বলেন, বলুন কি জিজ্ঞেস করতে চান। সে ব্যক্তি বলে, যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমি এ যুগের জন্য নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছি আর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পর উম্মতে মুহাম্মদীয়ায় নবুয়তের ধারা অব্যাহত আছে– তাহলে আপনি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলবেন? সেই ব্যক্তি ভেবেছিল, আমি এক মৌলভীর কাছে যাচ্ছি, কিন্তু সে জানতো না যে, সে এক মৌলভীর কাছে নয় বরং এমন এক ব্যক্তির কাছে যাচ্ছে যার দ্বারা খোদা তা'লা নিজ জামাতের কাজ নিতে চান। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, এ প্রশ্নের উত্তর মূলতঃ দাবিকারকের নিজের অবস্থার ওপর নির্ভর করে, সে এই দাবির যোগ্যতা রাখে কি না। যদি এই দাবিকারক সৎ না হয় তাহলে আমরা তাকে মিথ্যাবাদী বলবো আর দাবিকারক যদি কোন সৎ মানুষ হয়ে থাকে তাহলে আমি নিশ্চিত যে, আমারই ভ্রান্তি, সত্যিকার অর্থে নবী আসতে পারেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলতেন, আমার এই উত্তর শোনার পর সেই ব্যক্তি তার সাঙ্গ-পাঙ্গকে বলে, চল এই ব্যক্তি একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে, এখন তার সাথে কথা বলে কোন লাভ নেই। তিনি (রা.) বলতেন, এরপর আমি তাকে বললাম, আসল ব্যাপার কি আমাকে একটু খুলে বল। সে বললো, আপনাদের মির্যা সাহেব এই দাবি করেছেন যে,, আমার প্রতি আল্লাহ্ তা'লার ইলহাম নাযিল হয় আর আমি নবী-সদৃশ। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) তার এই কথা শুনে বলেন, নিঃসন্দেহে মির্যা সাহেব যা কিছু লিখেছেন তা সত্য আর আমি তাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখি।

একটি ঘটনা যা সরাসরি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর সাথে সম্পর্ক রাখে না আবার রাখেও। এটি তাঁর (রা.) বোনের সাথে সম্পৃক্ত ঘটনা যাকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এক পীর সাহেবকে প্রশ্ন করার বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। তার বোন আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আগে থেকেই কোন পীরের মুরীদ ছিলেন। সেই পীর বয়আতের পর তাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে, আজকালকার পীরদেরও অবস্থা একই। এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর বোন এক পীরের মুরীদ ছিলেন। তিনি কাদিয়ান আসেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেন। ফিরে যাওয়ার পর তার পীর সাহেব তাকে বলেন, তোর কি হলো যে, তুই মির্যা সাহেবের হাতে বয়আত করে এসেছিস? মনে হয় নূরউদ্দীন তোকে জাদু করেছে। ফিরে আসার পর হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-এর কাছে তিনি একথা উল্লেখ করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, পুনরায় পীর সাহেবের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হলে বলো, আপনার

কর্মের জন্য আপনি দায়ী হবেন আর আমার আমলের জন্য আমি দায়ী হবো। আমি মির্যা সাহেবকে মেনেছি এজন্য যে, যদি তাঁকে না মানি তাহলে কিয়ামত দিবসে আমাকে জুতোপেটা করা হবে। এখন আপনি বলুন! আপনি সেদিন কি করবেন? তিনি ফিরে গিয়ে পীর সাহেবকে এই কথাই বলেন। পীর তখন বলে, এটি মনে হয় নূরুদ্দীনেরই দুষ্টামি। সে-ই তোমাকে একথা শিখিয়ে আমার কাছে পাঠিয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে তোমার ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। কিয়ামত দিবস যখন আসবে এবং সব মানুষ পুল সিরাতে সমবেত হবে তখন তোমার পাপের বোঝা আমি বহন করবো, তুমি নাচতে নাচতে জান্নাতে চলে যেও। তিনি বলেন, পীর সাহেব! আমরা তো জান্নাতে চলে যাবো কিন্তু আপনার কি হবে? সেই পীর বলে, ফিরিশ্‌তা যখন আমার কাছে আসবে তখন আমি তাকে রক্তিম চোখ দেখিয়ে বলবো, আমাদের নানা ইমাম হোসেনের শাহাদাত কি যথেষ্ট ছিল না যে, আজ কিয়ামত দিবসে আমাদেরকেও কষ্ট দেয়া হচ্ছে? একথা শুনে ফিরিশ্‌তা লজ্জিত হয়ে চলে যাবে আর আমরাও লাফিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবো।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর সরলতা-সাধুতা আর আনুগত্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন, আমরা স্বয়ং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে দেখেছি, তিনি বৈঠকে পুরো বিনয়ের সাথে দীনহীনের ন্যায় বসতেন। একবার এক বৈঠকে বা মজলিসে বিয়ের কথা হচ্ছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী ডেপুটি মোহাম্মদ শরীফ সাহেব বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) হাঁটু উচিয়ে হয়ে বসে ছিলেন আর তাঁর অবনত মাথা ছিল হাঁটুর ওপর।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, মৌলভী সাহেব! জামাত বড় হওয়ার একটি উপায় হলো, বেশি সন্তান-সন্ততি নেয়া, তাই আমার মনে হয় জামাতের বন্ধুরা যদি একাধিক বিয়ে করে তাহলে এর মাধ্যমেও জামাতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) হাঁটু থেকে মাথা তুলে বলেন, হুযূর! আমি তো আপনার নির্দেশ মানতে প্রস্তুত কিন্তু এই বয়সে আমাকে কেউ মেয়ে দিতে সম্মত হবে না। তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) হেসে উঠেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, দেখ! এরূপ বিনয় এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি শ্রদ্ধাবোধের কারণেই তিনি এই মর্যাদা পেয়েছেন।

আজকালও অনেক মানুষকে বিয়ের ব্যাপারে অতি-উৎসাহী দেখা যায় কিন্তু এ কারণে নয়। যদি এর বৈধ কারণ থাকে বা কোন বৈধ কারণ থেকে থাকে তাহলে একাধিক বিয়ে করা নিষেধ নয় কিন্তু কেউ কেউ পরিবার ধ্বংস করে আরেকটি বিয়ে করে থাকে। তাদের একাজ থেকে বিরত থাকা উচিত আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এমনটি করতে কঠোরভাবে বারণ করেছেন।

খলীফা আউয়াল সংক্রান্ত একথা বলার পর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, তাঁর (রা.) সন্তান-সন্ততিদের কেউ কেউ খিলাফত এবং জামাত সম্পর্কে ভ্রান্ত পন্থা অনুসরণ করেছে কিন্তু আজও জামাত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে সম্মান করতে বাধ্য এবং তার জন্য দোয়া করে থাকে। আর সেই বিনয় এবং ভালোবাসার কারণেই যা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি তার ছিল আল্লাহ্ তা'লা আমাদের হৃদয়ে তার প্রতি এই মাহাত্ম্য সঞ্চার করেছেন বা সৃষ্টি করেছেন, যদিও তাঁর কতিপয় সন্তান-সন্ততি ভ্রান্ত পন্থা অবলম্বন করেছে কিন্তু তাসত্ত্বেও তাদের পিতার ভালোবাসা আমাদের হৃদয় থেকে উবে যায় না এবং আমরা তাকে দোয়ায় স্মরণ রাখি। আমরা দোয়া করি, খোদা তা'লা তার (রা.) মর্যাদা উন্নীত করুন কেননা, তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে তখন মেনেছেন যখন সারা পৃথিবী তাঁর (আ.) বিরোধী ছিল।

অতএব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে যা চিরস্থায়ী। জামাতের সংখ্যা বৃদ্ধির একটি উপায় হলো, সন্তান-সন্ততির আধিক্য এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) একথাও বলেন, যা মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত বা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে– তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন আমাদের বিয়ের প্রস্তাব দেন তখন সর্বপ্রথম এই প্রশ্ন করতেন, অমুক ব্যক্তির ঘরে সন্তান-সন্ততি কতজন, কয় ভাই এবং তাদের ক'জন সন্তান-সন্ততি রয়েছে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমার মনে আছে, যে ঘরে বা বাড়িতে মিঞাঁ বশীর আহমদের বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয় তাদের সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জিজ্ঞেস করেন, এ বংশে সন্তান-সন্ততি কতজন? যখন তিনি জানতে পারলেন, সাত ছেলে রয়েছে তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অন্য কোন কথা বিবেচনা করার পূর্বেই বলেন, খুব ভালো, এখানেই বিয়ে হওয়া উচিত। তিনি (রা.) বলেন, আমার এবং মিঞাঁ বশীর আহমদ সাহেবের বিয়ের প্রস্তাব এক সাথে দেয়া হয়। আমাদের উভয়ের বিয়ের সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একথাই জিজ্ঞেস করেছেন, খবর নেয়া উচিত, যেখানে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে সেই পরিবারে সন্তান-সন্ততি কতজন, কয় ছেলে, কয় ভাই। তো অন্যান্য কথার পাশাপাশি তিনি (আ.) 'অলুদান'-কে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন অর্থাৎ সন্তান-সন্ততির আধিক্যের বিষয়টি সামনে রেখেছেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এখনো অনেক মানুষ যখন আমার কাছ থেকে পরামর্শ চায় তখন আমি বলি, দেখ! যেখানে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে সেই ঘরের সন্তান-সন্ততি ক'জন?

আজকের বিশ্বে পরিবার-পরিকল্পনার ওপর অনেক জোর দেয়া হয়। কিন্তু যেসব দেশে এর ওপর অনেক জোর দেয়া হয়েছে তাদের মাঝে এখন উত্তরোত্তর এই চেতনা দৃঢ়তর হচ্ছে যে, এটি একটি ভ্রান্ত রীতি। মানুষ যখন প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় তখনই সমস্যা মাথাচাড়া দেয়। চীন দীর্ঘকাল পর্যন্ত নাগরিকদের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে রেখেছিল, একাধিক সন্তান যেন না হয়, নতুবা জরিমানা করা হবে বা শাস্তি দেয়া হবে। আর এমন ঘটনাবলীও সেখানে ঘটেছে যে, মানুষ হয় সন্তান নষ্ট করেছে অথবা জন্মের পর সন্তান-সন্ততিকে হত্যা করেছে। কিন্তু

এখন তাদের মাঝে এই চেতনাবোধ জাগ্রত হয়েছে, যার ফলে এখন সেই নিষেধাজ্ঞা তারা প্রত্যাহার করেছে।

অনুরূপভাবে অন্যান্য দেশেও এই বিধি-নিষেধ রয়েছে আর এখন বলা হচ্ছে, যদি এই বিধি-নিষেধ অব্যাহত থাকে তাহলে এসব দেশে স্বল্পকাল পর জনশক্তি আর থাকবে না, কাজ করার জন্য মানুষ পাওয়া যাবে না। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং বর্তমান প্রজন্মের মাঝে এত বড় শূন্যতা দেখা দিবে যে, সেই শূন্যতা বিদেশীদের মাধ্যমে পূর্ণ করতে হবে। এই কারণে এখন তারা নীতি পরিবর্তন করছে। মানুষ যদি খোদার ল' বা আইনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় আর নিজেকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান মনে করে তাহলে এমন পরিস্থিতিরই অবতারণা হয়। এখন তারা দুঃশ্চিন্তায় পড়েছে, আমাদের বিভিন্ন প্রজন্মের মাঝে এত বড় শূন্যতা দেখা দিবে, এটি পূরণ করা খুবই কঠিন হবে এবং জাতি ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

যাহোক এটি কথা প্রসঙ্গে একটি কথা আসলো, তাই বললাম। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, বিনয় এবং সরলতা সংক্রান্ত আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, খিদমত বা সেবার জন্য বিভিন্ন উপকরণের প্রয়োজন হতো, খাবার রান্না করানোর প্রয়োজন হতো। প্রথম দিকে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে যখন অতিথিরা আসতেন, সেই যুগের কথা হচ্ছে, বাজার ইত্যাদি করার প্রয়োজন হতো। স্পষ্টতই একাজ শুধু আমাদের বংশের বা খানদানের পক্ষে করা সম্ভব হতো না তাই প্রায় সময় জামাতের সদস্যরা মিলেমিশেই এই কাজ করতো। তখন রেগুলার বা নিয়মিত লঙ্গরখানা বা অতিথিশালা ছিল না। ইন্ধন বা জ্বালানি আসলে ঘরের চাকরানী বা দাসী আওয়াজ দিতো, জ্বালানি এসেছে, কেউ থাকলে আসুন আর জ্বালানি ভেতরে রেখে দিন। আগুন জ্বালানোর জন্য যেই লাকড়ি ইত্যাদি আসতো তার কথা বলা হচ্ছে। তখন পাঁচ-সাত মিলে জ্বালানি ভেতরে রেখে দিত। দু'তিন বার এমন হয়েছে, কাজের জন্য চাকরানী ডাকার পরেও কেউ আসে নি।

একবার অতিথিশালার জন্য বেশ কিছু উপলা আসে অর্থাৎ গোবরের জ্বালানি আসে। আকাশে মেঘ ছিল। চাকরানী জ্বালানি ভেতরে রাখার জন্য মানুষকে ডাকে কিন্তু তার কথায় কেউ কর্ণপাত করে নি। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি দেখেছি, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) মসজিদে আক্বসা থেকে কুরআনের দরস প্রদানের পর ফিরে আসছিলেন। তিনি তখন খলীফা ছিলেন না কিন্তু ধর্মের জ্ঞান, তাক্বওয়া এবং চিকিৎসার সুবাদে জামাতে তাঁর এক বিশেষ মর্যাদা ছিল, মানুষের ওপর তাঁর সুগভীর প্রভাব ছিল। দরস শেষে তিনি ঘরে ফিরছিলেন। চাকরানী আওয়াজ দেয়, কেউ থাকলে আসুন, বৃষ্টি হতে যাচ্ছে, গোবরের জ্বালানি উঠিয়ে ভেতরে রেখে দিন। কিন্তু কেউ কর্ণপাত করে নি। তিনি (রা.) যখন দেখলেন, চাকরানী বা সেবিকার কথার প্রতি কেউ মনোযোগ দিচ্ছে না বা কর্ণপাত করছে না, তখন তিনি বলেন, ঠিক আছে আজকে আমরাই কাজ করবো। একথা বলে তিনি গোবরের জ্বালানি উঠিয়ে ভেতরে রাখতে আরম্ভ করেন। এখন এটি জানা কথা, এক ছাত্র যখন শিক্ষককে গোবরের জ্বালানি তুলতে দেখবে তখন সেও শিক্ষকের সাথে একই কাজ আরম্ভ করবে। এই রীতি অনুসারে অন্যরাও যোগ দেয় এবং জ্বালানি উঠিয়ে ভেতরে রাখা আরম্ভ করে। তিনি (রা.) বলেন, আমার মনে আছে দু'তিন বার আমি তাঁকে এমনটি করতে দেখেছি। যখনই তিনি এমনটি করতেন অন্যরাও তাঁর সাথে যোগ দিত।

এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-এর অভ্যাস ছিল তিনি যখন যার পর নাই আনন্দিত হতেন এবং ভালোবাসার সাথে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কথা উল্লেখ করতেন তখন মির্যা শব্দ ব্যবহার করতেন এবং বলতেন, আমাদের মির্যা, আমাদের মির্যার অমুক কথা। প্রারম্ভিক যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন কোন দাবিও করেন নি তখন থেকেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে যেহেতু তার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল তাই তখন থেকেই তিনি এই শব্দ ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন। অনেক নির্বোধ তখন আপত্তি করতো আর বলতো, হযরত মৌলভী সাহেবের হৃদয়ে নাঊযুবিল্লাহ্ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নেই।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে মানুষ সচরাচর খলীফা আউয়াল (রা.)-কে মৌলভী সাহেব বা বড় মৌলভী সাহেব বলে সম্বোধন করতো। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি নিজে মানুষের মুখে কয়েক বার এই আপত্তি শুনেছি এবং হযরত মৌলভী সাহেবকে এর উত্তর দিতেও শুনেছি। একবার এই মসজিদেই অর্থাৎ মসজিদে আক্বসায় (যেখানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) খুতবা দিচ্ছিলেন) হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) দরস দিচ্ছিলেন। দরস প্রদানকালে তিনি বলেন, অনেকেই আমার বিরুদ্ধে আপত্তি করে বলে, আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রাখি না, অথচ আমি ভালোবাসা এবং প্রেমের আতিশয্যে এই শব্দ ব্যবহার করি। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, বাহ্যিক শব্দ দেখা উচিত নয় বরং সেসব শব্দের পিছনে অন্তঃর্নিহিত যে উদ্দেশ্য থাকে তা দেখা উচিত।

দ্বিপাক্ষিক নিষ্ঠা এবং ভালোবাসার আরেকটি দৃষ্টান্ত তিনি (রা.) তুলে ধরেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা কেমন ছিল তা কারো অজানা নয়। তিনি (রা.) বলেন, তাসত্ত্বেও তাঁর দ্রুত হাঁটার অভ্যাস ছিল না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন ভ্রমণে যেতেন তখন খলীফা আউয়াল (রা.)ও সাথে থাকতেন কিন্তু কিছু দূর গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন দ্রুত হাঁটতেন তখন খলীফা আউয়াল (রা.) গ্রামের বাহিরে একটি বটবৃক্ষের তলায় বসে পড়তেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন ভ্রমণ শেষে ফিরে আসতেন তিনি (রা.) পুনরায় তাঁর সাথে যোগ দিতেন। কেউ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে বলে, হযরত মৌলভী সাহেব ভ্রমণের জন্য যান না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, তিনি তো প্রত্যেক দিনই যান। তখন তাঁকে বলা হয়, তিনি ভ্রমণের জন্য সাথে যাত্রা করেন ঠিকই কিন্তু এরপর বটবৃক্ষের নিচে বসে পড়েন আবার ফেরার পথে সাথে যোগ দেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এরপর সব সময় হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-কে ভ্রমণের সময় সাথে রাখতেন। তিনি যখন দ্রুত হাঁটতেন আর খলীফা আউয়াল (রা.) পিছিয়ে পড়তেন, তিনি (আ.) একটু দাঁড়িয়ে বলতেন মৌলভী সাহেব! অমুক কথার অর্থ কি? মৌলভী সাহেব তখন দ্রুত এসে তাঁর সাথে যোগ দিতেন এবং হাঁটা আরম্ভ করতেন। এর স্বল্পক্ষণ পর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) পুনরায় দ্রুত হেঁটে এগিয়ে যেতেন এবং কিছু দূর গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়তেন এবং বলতেন মৌলভী সাহেব! অমুক কথাটি এমন। এভাবে ভ্রমণকালে বিভিন্ন আলোচনা হতো। মৌলভী সাহেব পুনরায় দ্রুত হেটে তাঁর (আ.) কাছে পৌঁছতেন আর দ্রুত হাঁটার কারণে তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যেত কিন্ত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাকে (রা.) সাথে রাখতেন। মৌলভী সাহেব ৩০/৪০ গজ পর পিছিয়ে পড়তেন। মসীহ্ মাওউদ (আ.) আবার কোন কথা বলতে গিয়ে মৌলভী সাহেবকে সম্বোধন করতেন এবং তিনি দ্রুত হেঁটে এসে তাঁর সাথে যোগ দিতেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এমনটি করার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল মৌলভী সাহেবকে দ্রুত হাঁটতে অভ্যস্ত করা। দ্রুত হাঁটার অভ্যাস না থাকার কারণেই তাঁর গতি ছিল মন্থর। চিকিৎসা পেশা এমন যে, প্রায়শঃ মানুষকে বসে থাকতে হয়, বাহিরে কোন রোগী দেখতে যেতে হলেও বাহন প্রস্তুত থাকে, তাই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর দ্রুত হাঁটার অভ্যাস ছিল না। নতুবা তাঁর মাঝে যে পর্যায়ের আন্তরিকতা ছিল বা যতটা আন্তরিকতা ছিল সে সম্পর্কে স্বয়ং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, 'চে খুশ বূদে আগার হার ইয়াক্‌য্ উম্মাত নূরে দীঁ বূদে' অর্থাৎ উম্মতের সবাই যদি নূরউদ্দীন হয়ে যেতো তাহলে কতই না ভালো হতো।

আরেকটি দৃষ্টান্ত যার মাধ্যমে খলীফা আউয়াল (রা.)-এর নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা প্রকাশ পায় তা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বর্ণনা করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) একবার নিজের চিকিৎসালয়ে বসেছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তখন দিল্লীতে অবস্থান করছিলেন। হযরত মীর সাহেব সেখানে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমন ভয়াবহ পেট ব্যথা হয় যে, ডাক্তাররা বলে, অপারেশন করানো আবশ্যক। কেউ কেউ বলে, ইউনানী ঔষধের মাধ্যমে অপারেশন ছাড়াও আরোগ্য লাভ হতে পারে।

তাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খলীফা আউয়াল (রা.)-কে টেলিগ্রাম পাঠান, যেই অবস্থায়-ই থাকুন না কেন চলে আসুন। তিনি খুব সম্ভব তখন ক্লিনিকে বসে ছিলেন, কোটও পরিহিত ছিলেন না আর সাথে পয়সাও ছিলো না। তিনি খুব সম্ভব হাকীম গোলাম মোহাম্মদ মরহুম অমৃতসরীকে সাথে নিয়ে সেভাবেই যাত্রা করেন। হাকীম গোলাম মোহাম্মদ সাহেব বলেন, আমি ঘর থেকে টাকা পয়সা নিয়ে আসি কিন্তু তিনি বলেন, না, নির্দেশ হলো, যে অবস্থায়-ই থাকো চলে আসো।

সবাই জানে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) যেভাবে পূর্বেই বলা হয়েছে ভালো হাঁটতে পারতেন না, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন ভ্রমণে যেতেন তখন তিনি পিছিয়ে পড়তেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করতেন যে, হযরত মৌলভী সাহেব কোথায়? খলীফা আউয়াল (রা.) পরে এসে তাঁর সাথে যোগ দিতেন নতুবা পিছিয়ে থাকতেন, আবার মসীহ্ মাওউদ (আ.) দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেন যেভাবে ঘটনা আমি শুনিয়েছি। তিনি খুব সম্ভব হাকীম গোলাম মোহাম্মদ সাহেবকে সাথে নিয়ে পদব্রজে বাটালায় পৌছেন এবং বাটালা স্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা করেন। হাঁটার ক্ষেত্রে দুর্বল ছিলেন কিন্তু যেহেতু নির্দেশ এসেছে তাই তখন সেভাবেই হেঁটে বাটালা স্টেশনে পৌছে যান দেখুন! এই ছিল নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা। হাঁটতে তাঁর কষ্ট হতো কিন্তু নির্দেশ পাওয়ার পর বাটালা পর্যন্ত প্রায় ১১ মাইল দূরত্বের পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেন।

হাকীম সাহেব বলেন, ভাড়া ইত্যাদির কি হবে? হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) বলেন, এখানে বস, আল্লাহ্ তা'লা নিজেই কোন ব্যবস্থা করবেন। এটি খোদার ওপর তাওয়াক্কুল বা খোদার ওপর ভরসা করার দৃষ্টান্ত। তখন এক ব্যক্তি আসে এবং জিজ্ঞেস করে, আপনি কি হাকীম নূরউদ্দীন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। সেই ব্যক্তি বলে, গাড়ী আসতে ১০/১৫ মিনিট বাকী আছে, আমি স্টেশন মাষ্টারকে আপনার জন্য অপেক্ষা করার অনুরোধ করেছি, আমি বাটালার তহশীলদার। আমার স্ত্রী মারাত্মক অসুস্থ, আপনি গিয়ে রোগীনিকে একটু দেখে আসুন। তিনি যান আর রোগীনিকে দেখে ব্যবস্থাপত্র লিখে দেন এবং স্টেশনে ফিরে আসেন। সেই ব্যক্তিও সাথে আসে অর্থাৎ তহশীলদারও সাথে আসে এবং বলে, আপনি গিয়ে গাড়ীতে বসুন, আমি টিকেট নিয়ে আসছি। সে ব্যক্তি তখন সেকেন্ড ক্লাস এবং থার্ড ক্লাসের একটি করে টিকেট কিনে নিয়ে আসে আর একই সাথে পঞ্চাশ রূপী নগদ দেয় এবং বলে, এটি তুচ্ছ হাদীয়া, গ্রহণ করুন। এরপর তিনি (রা.) দিল্লী পৌঁছেন এবং গিয়ে মীর নাসের নবাব সাহেবের চিকিৎসা করেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এটিই সত্যিকার তাওয়াক্কুল বা খোদার ওপর নির্ভরশীলতা। আল্লাহ্ তা'লা দেখেন, আমার বান্দা সত্যিকার অর্থে তাওয়াক্কুল বা নির্ভর করে কি না।

এই পরীক্ষা করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'লা হয়তো মানুষকে অনাহারেও রাখতে পারেন। সব সময় পাশ করা আবশ্যক নয়, অনেক সময় পরীক্ষা হয়, মানুষকে অভুক্তও থাকতে হয়, মানুষকে উলঙ্গও রাখতে পারেন, মৃত্যুর মুখেও ঠেলে দিতে পারেন, যেন মানুষকে বলা যায়, আমার এই বান্দা আমার ওপর নির্ভর করে। অনেক সময় এমনও হয়, লেঙ্গুট বা নেংটি পড়তে হয়, কাপড় ছিড়ে টুকরো হয়ে ঝুলতে থাকে এবং অনেককে তাকে এভাবে উলঙ্গ দেখিয়ে সাহায্য করার জন্য ইলহাম করে, অনেককে আক্ষরিকভাবে ইলহাম করেন, আর কতককে তার অবস্থা দেখিয়ে সাহায্যের প্রেরণা সঞ্চার করেন। কিন্তু যারা সত্যিকার অর্থে তাওয়াক্কুল করে এবং আল্লাহ্ তা'লার ওপর নির্ভর করে তারা মানুষের কাছে হাত পাতে না বরং

আল্লাহ্ তা'লা নিজেই ব্যবস্থা করেন। যারা খোদার ওপর নির্ভর করে তারা সাহায্যের জন্য কারো কাছে যান না বরং আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাদের অভাব মোচনের জন্য মানুষকে পাঠান। এটি তাওয়াক্কুলের অনেক বড় একটি দৃষ্টান্ত, যেই পদমর্যাদায় তিনি (রা.) উপনীত ছিলেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর যে পদমর্যাদা ছিল, তা ছিল স্বতন্ত্র এবং অনেক বড় পদমর্যাদা। তিনি আল্লাহ্‌র অনেক বড় ওলী বা বন্ধু ছিলেন। কিন্তু এটি বর্ণনা করতে গিয়ে অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেয়া উচিত নয় অর্থাৎ এতটা অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিও না বা এমন পর্যায়ে নিয়ে যেয়ো না যেখানে গিয়ে মানুষকে তা বর্ণনা করার জন্য বাড়াবাড়ি করতে হয়। তাঁর সন্তান-সন্ততির কেউ কেউ এটি বর্ণনা করতে গিয়ে অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিয়েছে আর কোন কোন লাহোরীও এমনটি করে থাকে। কিন্তু লাহোরীরা তাঁর (রা.) ভালোবাসায় এমনটি করে না বরং নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করা হলো তাদের উদ্দেশ্য।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, সত্যের বহিঃপ্রকাশ থেকেও বিরত থাকা উচিত নয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন, তার (রা.) মর্যাদাকে উন্নীত করেছেন। যেমন হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, নিঃসন্দেহে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) আবু বকর (রা.)-এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মৌলভী নূরউদ্দীন (রা.)-এর প্রশংসা করেছেন। কিন্তু কুরআন হযরত আবু বকর (রা.)-এর সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য নাযিল হয় নি আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইলহামে কোথাও এ কথার উল্লেখ করা হয় নি যে, আমরা তোমাকে নূরউদ্দীনের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পাঠিয়েছি। তবে হ্যাঁ, যা সত্য ছিল, যা বাস্তবতা ছিল তা তিনি (আ.) প্রকাশ করেছেন। যেমন তিনি (আ.) বলেন,'চে খুশ বূদে আগার হার ইয়াক্‌য্ উম্মাত নূরে দীঁ বূদে' অর্থাৎ কতইনা ভালো হতো যদি উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি নূরউদ্দীন হয়ে যেতো। এটি একটি সত্য ও বাস্তবতা ছিল যা বলা উচিত ছিল। যিনি কুরবানী করেছেন অর্থাৎ খলীফা আউয়াল (রা.) যে কুরবানী করেছেন সেই কুরবানী বা ত্যাগের কথা না বলা অকৃতজ্ঞতার নামান্তর। তিনি (রা.) বলেন, আমার মনে আছে, একবার এক রোগী আসে এবং বলে, আমি মৌলভী সাহেবের চিকিৎসা গ্রহণ করেছি, এতে আমার অনেক উপকার হয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সেদিন অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু একথা শোনার পর তিনি উঠে বসেন এবং হযরত আম্মাজান (রা.)-কে বলেন, আল্লাহ্ তা'লাই মৌলভী সাহেবকে অনুপ্রাণিত করে এখানে এনেছেন। এখন সহস্র সহস্র মানুষ তার দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। মৌলভী সাহেব যদি এখানে না আসতেন তাহলে কীভাবে এদের চিকিৎসা হতো। অতএব মৌলভী সাহেবের সত্ত্বাও খোদার অনেক বড় এক অনুগ্রহ। এই হলো কৃতজ্ঞতা কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি (আ.) কোন অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেন নি।

এরপর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এক সাহাবীর বরাতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর বিনয়ের পরাকাষ্ঠার উল্লেখ করেন। তিনি (রা.) এক সাহাবীর ঘটনা বর্ণনা করেন, অর্থাৎ সেই সাহাবী একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে দেখা করতে আসেন, তিনি মসজিদে মুবারকে বসেছিলেন। দরজার কাছে জুতা রাখা ছিল। সাদাসিদে পোশাক পরিহিত একজন মানুষ এসে জুতার কাছে বসেন। সেই সাহাবী বলেন, আমি ভাবলাম, এ হয়তো কোন জুতা চোর হবে তাই আমি আমার জুতার ওপর দৃষ্টি রাখি, কোথাও আবার সে তা নিয়ে পালিয়ে না যায়। তিনি বলেন, এর স্বল্পকাল পর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইন্তেকাল করেন।

আমি শুনেছি, তাঁর (আ.) জায়গায় অন্য এক ব্যক্তি খলীফা হয়েছেন। আমি বয়আতের জন্য আসি। বয়আতের জন্য হাত প্রসারিত করে আমি দেখি, ইনি সেই ব্যক্তি যাকে আমি আমার অজ্ঞতাবশতঃ জুতা চোর ভেবেছিলাম অর্থাৎ খলীফা আউয়াল (রা.)। আমি তখন খুবই লজ্জিত হই। তাঁর অভ্যাস ছিল, তিনি জুতার কাছে এসে বসে পড়তেন আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ডাকলে তিনি কিছুটা এগিয়ে আসতেন। এরপর যখন তিনি (আ.) বলতেন, আজকে মৌলভী নূরউদ্দীন সাহেব আসেন নি? তখন তিনি আরো কিছুটা এগিয়ে আসতেন। এভাবে বার বার বলার পর তিনি সামনে আসতেন। এই সাহাবী বর্ণনা করেন, আমি তাঁর সন্তান-সন্ততিকেও বলতাম, এই মর্যাদা যা তিনি অর্জন করেছেন তা তিনি এভাবে বিনয়ের মাধ্যমেই অর্জন করেছেন।

অতএব এই ছিল তাঁর (রা.) বিনয়, সেই ব্যক্তির বিনয় যিনি জ্ঞান এবং তত্ত্বের পরম মার্গে উপনীত ছিলেন, যিনি ভারতের শীর্ষ পর্যায়ের চিকিৎসকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁকে অসাধারণ সম্মানে ভূষিত করেছেন। কিন্তু এসব বিষয় তাঁকে আরো অধিক বিনয়ী করে তুলেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করুন এবং তাঁর নামে নৈরাজ্যবাদীদেরকে আল্লাহ্ তা'লা বিবেক বুদ্ধি দিন আর আমাদেরকেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইচ্ছানুসারে এই নমুনা এবং এই আদর্শ দেখে শিক্ষা লাভের তৌফিক দান করুন।

আজ মরিশাসের বার্ষিক জলসা হচ্ছে। মরিশাস আহমদীয়তের একশত বছর পূর্ণ হয়েছে। তারা এ বছর নিজেদের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের এই জলসা সকল অর্থে বরকতময় করুন আর এই শত বছর সেখানে ভবিষ্যৎ উন্নতির ভীত প্রমাণিত হোক, তারা যেন নতুন নতুন পরিকল্পনা হাতে নিতে পারে। সেখানে কতিপয় নৈরাজ্যবাদীও রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের হাত থেকে জামাতকে নিরাপদ রাখুন এবং সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। তাদের এই জলসা এবং অনুষ্ঠানমালাকে সার্বিকভাবে তিনি আশিসময় করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।

আল্ ইস্তিফতা

বিবেকের কাছে প্রশ্ন

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

(৮ম কিস্তি)

হে সুচিন্তাবিদগণ, সে আংটিটি এখনও সংরক্ষিত আছে আর নিম্নে এর ছাপ দেয়া হলো:

أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ

* এরপর আল্লাহ্ যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাই করেছেন, যেমন কথা তেমন কাজ। আল্লাহ্ তা'লা একটি ছোট্ট বীজকে বিশাল মহীরুহে এবং পরিপক্ক ও সুস্বাদু ফলে পরিণত করেছেন। অস্বীকারকারীদের সব দল সমবেত হলেও একে অস্বীকারের কোনো উপায় নেই। কেননা, সাক্ষীদের সাক্ষ্য অস্বীকারকারীর মুখে কালিমা লেপন করে। আর দীপ্ত-দিবাকরকে অস্বীকারই বা কীভাবে করা যায়? এরপর খোদার কথা যখন পরিপূর্ণতা লাভ করলো আর আমার প্রভু আমার পাত্র ভরে দিলেন তখন মানুষ আমার দ্বারে ছুটে এল। আমি বিন্দু থেকে সিন্ধুতে আর অনু থেকে বিশাল পর্বতে, একটা ছোট্ট চারা থেকে ফলসমৃদ্ধ একটি বৃক্ষে পরিণত হয়েছি। এক কীট থেকে বীরবেশে সামনে এসেছি; এতে নিশ্চয় চক্ষুষ্মানদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

একইভাবে আমার প্রভু আমাকে প্রারম্ভেই দীর্ঘায়ু লাভের সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, تَرَى نَسْلاً بَعِيدًا [অর্থাৎ, তুমি সুদূরের প্রজন্ম বা কয়েকটি প্রজন্ম দেখে যেতে পারবে–অনুবাদক] আমার প্রভু আমাকে দীর্ঘজীবি করেছেন যার কল্যাণে আমি সরাসরি প্রজন্ম এবং এরপর আমার সন্তানের প্রজন্ম দেখেছি। তিনি আমাকে সেই নির্বংশ ব্যক্তির মত পরিত্যাগ করেন নি যার কোনো সন্তান হয় না। এক পুণ্যবানের জন্য এই নিদর্শনই যথেষ্ট।

*** টিকা**

এই আংটিটি বানানোর পর ত্রিশ বছরাধিক কাল পেরিয়ে গেছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কৃপা ও করুণার নিদর্শন যে আজ পর্যন্ত এটি নষ্ট হয় নি। আর সে যুগে আমার সম্মান লাভের কোনো লক্ষণ বা খ্যাতি অর্জনের কোনো উল্লেখই ছিল না। আমি নির্জন কোণে সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা-বঞ্চিত অবস্থায় জীবন যাপন করতাম-লেখক।

সুতরাং, হে আলেম সমাজ! মুহাদ্দিস ও বুৎপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, আমাকে একটু বলুন, আল্লাহ্ কি এসব ব্যবহার এমন এক ব্যক্তির সাথে করছেন যার সম্পর্কে তিনি জানেন যে, সে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা দাবি করছে আর তাঁর চোখের সামনে মিথ্যা বলছে? আপনাদের বিবেক কি একথা বলতে পারে? আপনারা কখনও কি আল্লাহ্‌র এই রীতি দেখেছেন যে, এক প্রতারককে তিনি দীর্ঘকাল অদৃশ্যের সংবাদ দিয়ে যাবেন এবং সত্য নবীর ন্যায় তার জন্য স্বীয় সকল নিয়ামতকে পরিপূর্ণতা দেবেন এবং সকল ক্ষেত্রে তাকে প্রকাশ্য সম্মানে ভূষিত করবেন? মিথ্যাচার সত্ত্বেও তাকে যৌবন থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত অবকাশ দেবেন? তাকে সহস্র-সহস্র সাথী দান করবেন আর সে তার সাথীদের পক্ষ থেকে পূর্ণ বিশ্বস্ততা লাভে ধন্য হবে? তিনি তাকে সাহায্য করবেন আর তার শত্রুদের কুকুরের মত কষ্টে-নিপতিত অবস্থায় পরিত্যাগ করবেন? তাকে এমন সব দানে কৃতার্থ করবেন যা সমসাময়িক যুগের অন্য কাউকে দেয়া হয় নি? যে তার সাথে মুবাহিলা করে তাকে তার চোখের সামনে ধ্বংস, লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন? যে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট আর দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন এবং মিথ্যা আরোপকারী ও প্রতারক; আপনারা কি মনে করেন যে, সে এমন সাহায্য পেতে পারে? বা আপনারা কি তার পক্ষে আল্লাহ্‌র এমন সাহায্য কখনও প্রত্যক্ষ করেছেন?

আল্লাহ্ আপনাদের হিদায়াত দিন, আপনাদের কি হয়েছে? আপনারা কেন মুত্তাকীদের মত চিন্তা করেন না? আর কতদিন আল্লাহ্‌র সাহায্যপ্রাপ্ত বান্দাদের কাফির আখ্যায়িত করবেন? আপনারা আমাকে কেন মিথ্যাবাদী আখ্যা দেন তা আমি জানি না।

আমি কি আল্লাহ্‌র কিতাব এবং রসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন তা অস্বীকার করেছি, না-কি আপনারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন দেখেন নি, (বলে মিথ্যে অজুহাত দেখাচ্ছেন) যে কারণে সন্দেহ করছেন? আমি কি আপনাদের কাছে অসময়ে এসেছি, যে কারণে হয়ত আপনারা বলতে পারেন, সে সেই ভাবে এসেছে যেভাবে প্রতারকরা এসে থাকে? আপনাদের কী হয়েছে যে, আপনারা সত্য চিনেন না আর দেখেনও না ?

ইতিহাসের পাতায় মিথ্যারোপকারী জাতি এবং মিথ্যা দাবিকারকদের অবলুপ্ত বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করুন আর দেখুন! তাদের মিথ্যা আরোপের কারণে আল্লাহ্ কীভাবে তাদের সমূলে উৎপাটন করেছেন? তিনি তাদের ধ্বংস করেছেন বরং তাদের নাম-চিহ্ন পর্যন্ত অবশিষ্ট রাখেন নি। তিনি তাদের চিহ্ন মিটিয়ে দিয়েছেন আর মিথ্যা বলা ও সত্যবাদীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর কারণে তাদের সাহায্যকারীদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। যদি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য না করা হতো, তাহলে শান্তি উঠে যেতো আর পবিত্র-অপবিত্র, বিরান ও আবাদ এবং গৃহীত ও প্রত্যাখ্যাতদের মাঝে কোনো পার্থক্যই আর অবশিষ্ট থাকত না।

আল্লাহ্ আপনাদের প্রতি করুণা করুন। জেনে রাখুন! প্রতারণা ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে আর মিথ্যা আরোপকারী অবশেষে লাঞ্ছিত হয়। আর খোদার প্রতি মিথ্যা আরোপকারীরা প্রত্যাখ্যাত জাতি। সর্বজ্ঞানী প্রভু তাদের সাহায্য করেন না। আল্লাহ্ তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেন না আর তাদের তূণে কোনো তীরও থাকে না। বুলি আওড়ানো ছাড়া তাদের কাছে আর কোনো সম্পদ থাকে না। সমর্থনপুষ্ট ও গৃহীতজনের ন্যায় তাদের সাহায্য করা হয় না। খোদার রীতি হলো, যখন মিথ্যাবাদীদের কেউ কোনো সত্যবাদীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দন্ডায়মান হয় বা তাঁর সাথে বিতন্ডায় জড়ায় এবং মুবাহিলার মানসে তার সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, আল্লাহ্ লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার সাথে তাকে ভূপাতিত করেন। সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীদের মাঝে পার্থক্য করার ক্ষেত্রে খোদা তা'লার রীতি এভাবেই চলে আসছে। মিথ্যাবাদীদের আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য প্রদান করা হয় না, আর তাঁরা ফিরিশতার সাহায্যও লাভ করে না। আকাশ থেকে কোনো স্বর্গীয় জ্যোতিও তাদের লাভ হয় না আর তাদের সামনে পুণ্যবানদের আধ্যাত্মিক খাঞ্চা উপস্থাপন করা হয় না। তারা দুনিয়া-লোভী কুকুর বৈ কিছু নয়, তুমি তাদের এরই প্রতি আকৃষ্ট দেখবে। জগতের মোহে তুমি তাদের হৃদয়কে কার্পণ্যে ভরা পাবে। নিজেদের বিরুদ্ধে তারা নিজেরাই সাক্ষ্য দেবে। এমন মানুষ অবশেষে লাঞ্ছিত হয়। তখন গিয়ে সেই পার্থক্যকারী সত্তাকে চেনা যায়, যিনি পবিত্র থেকে অপবিত্রকে পৃথক করেন। যারা তাদের প্রভুর সন্নিধানে সত্য বলেছে আল্লাহ্ তাঁদের দুনিয়া বিমুখ রেখেছেন, আর তাঁদের হৃদয় তাঁর নিজের প্রতি আকৃষ্ট করেছেন। তাঁরা তাঁর খাতিরে সকল দুঃখ-কষ্ট ও শাহাদতকে হাসিমুখে বরণ করেছেন। নিজেদের ভিতর-বাহির সবই তাঁকে সঁপে দিয়েছেন। তাদের যা কিছু ছিল, সর্বস্ব নিয়ে তারা তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছেন আর তাঁর ভালোবাসা লাভের আশায় ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তাঁরা তাঁদের ভালেবাসার তওয়াফ বা প্রদক্ষিণ সম্পন্ন করেছেন। তাঁরাই এমন লোক যাদের এ পৃথিবী ও পরকালে লাঞ্ছিত করা হবে না। সম্মান ও আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রাসাদে তাঁরা অবস্থান করবেন। শত্রুর মুকাবিলায় তাঁরা হোঁচট খাবেন না।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁদের সকল প্রকার পরাজয় থেকে রক্ষা করবেন। সকল স্খলন থেকে তিনি তাদের রক্ষা করবেন ও ক্ষমা করবেন আর সকল পতনের মুখে তিনি তাদের সতেজতা ও আরামের বিধান করবেন; ফলে তাঁরা নিরাপদ জীবন যাপন করবেন। তাঁদের এবং মিথ্যা দাবীকারকদের ভেতর পার্থক্য দীপ্ত দিবাকর ও তমসাচ্ছন্ন রাতের পার্থক্যের ন্যায় বা সুপেয় দুধ ও অত্যন্ত টক সিরকার পার্থক্যের মত। দর্শকদের সামনে তাঁদের ললাটের জ্যোতি অত্যন্ত স্পষ্ট। তাঁরা এ জগতের নারী ও তাদের সৌন্দর্যকে বিদায় জানিয়ে পরকালকে আলিঙ্গন করেছেন আর এর আরামদায়ক পরিবেশের স্বাদ পেয়েছেন। নিজেদের কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে তাঁরা আল্লাহ্‌তে প্রশান্তি খুঁজে পেয়েছেন। তাঁরা খোদার সামনে সেজদাবনত হয়েছেন, সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে তাঁরই দিকে ধাবিত হয়েছেন। তাঁরা পৃথিবীতে মোটা ভাত ও মোটা কাপড় (নিম্নমানের সবজি) নিয়েই সন্তুষ্ট। এর ফলশ্রুতিস্বরূপ তিনি

তাঁদের আত্মাকে বিদ্যুতোজ্জ্বল পোশাকে সজ্জিত করেছেন, একই সাথে পছন্দনীয় ও সুস্বাদু খাবারও দিয়েছেন। আর তাঁরা যা কিছু ফেলে এসেছিলেন তিনি তাঁদেরকে তার সবই ফেরত দিয়েছেন।

আল্লাহ্ নিষ্ঠাবান বান্দাদের সাথে এমন ব্যবহারই করেন। তাঁদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে আল্লাহ্ তাঁদের পূত-পবিত্র পেয়েছেন। তিনি দেখেছেন যে, তাঁরা তাঁকে অন্য সকলের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন; তাই তিনিও তাঁদেরকে অন্য সবার ওপর প্রধান্য দিয়েছেন। তিনি দেখেছেন, তারা তাঁর (আল্লাহ্‌র), তাই তিনিও তাঁদের হয়ে গেছেন আর তিনি তাঁদেরকে আলোর অবতরণস্থল বানিয়েছেন। প্রথম যুগের মানুষ বা আউয়ালীন থেকে আরম্ভ করে শেষ যুগের মানুষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র সুন্নত বা রীতি এমনই চলে এসেছে। তাঁদের জন্য অনেক অন্ধকার কূপ খনন করা হয়, কিন্তু খোদা তা'লা স্বহস্তে তা থেকে তাঁদের রক্ষা করেন। তাদের ধ্বংস করার জন্য যে সমস্যাই মাথা চাড়া দিক না কেন তার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা সত্যিকার অর্থে তাদের সম্মান প্রকাশ করেন বা প্রতিষ্ঠিত করেন। কোনো বিপদ তাঁদের ধ্বংস করার জন্য আসে না বরং আল্লাহ্ এর মাধ্যমে প্রমাণ করতে চান যে, তাঁরাই তাঁর সমর্থনপুষ্ট। তাঁরা এমন মানুষ যাদেরকে তাঁদের বন্ধু (আল্লাহ্) মনোনীত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা কেবল তখনই কোনো জাতিকে লাঞ্ছিত করেন যখন এসব নোংরাদের হাতে তাঁদের হৃদয় কষ্ট পায়। সৃষ্টির মাঝে আল্লাহ্‌র সুন্নত বা রীতি এভাবেই চলে আসছে। তাঁরা আল্লাহ্‌র কাছে হাত উঠালে তিনি তাঁদের দোয়া গ্রহণ করেন। তাঁরা বিজয়ের দোয়া করলে সকল অত্যাচারী কৃপণ ব্যর্থ হয় আর তাঁরা আল্লাহ্‌র নিরাপত্তার ছায়ায় জীবন যাপন করেন। তুমি তাঁদের জীবিত চলাফেরা করতে দেখ কিন্তু সত্যিকার অর্থে তারা খোদার জন্য বিলীন মানুষ। তুমি কি মনে কর যে, এমন মানুষ কেবল অতীতেই ছিল? আর আল্লাহ্ তাঁদের মত জামাত আখারীনদের (শেষ যুগের লোক) মাঝে সৃষ্টি করতে চান না? খোদা তোমার মঙ্গল করুন; এটি একটি প্রকাশ্য ভ্রান্তি।

হে ভাই! আল্লাহ্ তোমায় মার্জনা করুন, তুমি বিশ্ব প্রতিপালকের অভ্যাস বা রীতিনীতি উপলব্ধি করা থেকে অনেক দূরে চলে গেছ। যদি তাদের অস্তিত্ব না থাকতো তাহলে পৃথিবী এবং তাতে যা কিছু আছে সব নৈরাজ্যে ভরে যেতো। তাই কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অস্তিত্ব অত্যাবশ্যকীয়। তোমাদের প্রতি কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত করা এবং তোমাদের আলো গ্রহণের যোগ্য করে তোলার জন্য আমার প্রভু আমাকে প্রেরণ করেছেন। তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না আর হিদায়াত বা সঠিক পথকে অবজ্ঞা কর? তোমরা কি মনে কর, বৃথা কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্য তোমাদের লাগামহীন ছেড়ে দেয়া হবে? আজকের পর আগামীকাল বলতেও কিছু আছে। আমি কামনা-বাসনার বসবর্তী হয়ে তোমাদের কাছে আসিনি এবং আমি আত্মপ্রকাশে বা আত্মপ্রচারেও আগ্রহী ছিলাম না বরং, কবরবাসীদের ন্যায় নিভৃতে জীবন কাটিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। আত্মপ্রকাশের প্রতি আমার ঘৃণা সত্ত্বেও তিনি আমাকে প্রকাশ করেছেন আর যশ ও খ্যাতির প্রতি অবজ্ঞা সত্ত্বেও তিনি আমার নামকে সারা বিশ্বে সমুজ্জ্বল করেছেন। আমি গুপ্ত রহস্য, লাজুক সজারু এবং মাটিতে মিশ্রিত গলিত হাড় বা খেজুর বীজের গুরুত্বহীন ঝিল্লির ন্যায় এক দীর্ঘজীবন কাটিয়ে দিয়েছি। এরপর আমার প্রভু আমাকে তা দিয়েছেন যা শত্রুকে ক্রোধান্বিত করছে আর তিনি সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল ওহীর মাধ্যমে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নির্বোধরা উত্তেজিত হয়ে অত্যাচার আরম্ভ করে। তাদের মধ্যে কিছু এমনও ছিল, দুষ্কৃতির ক্ষেত্রে যারা ছিল অন্যদের তুলনায় বেশী ভয়াবহ। তাদের পক্ষ থেকে আমার প্রতি অগ্নিকুন্ডলি ও প্রচণ্ড ঝড় বইতে থাকে।

হে বুদ্ধিমানগণ! তাদের পরিণাম কি হয়েছে তোমরা তা দেখেছ? তাদের কথা বলার পর এখন আমি তোমাদের আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বান করি। যদি তোমরা গ্রহণ কর তাহলে আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। আর যদি তোমরা অস্বীকার কর তাহলে তিনিই তোমাদের নিকট থেকে হিসাব নেবেন। অতএব তার প্রতি শান্তি, যে হিদায়াত বা সঠিক পথের অনুসরণ করে।

(চলবে)

ভাষান্তর: মওলানা ফিরোজ আলম
মুরব্বী সিলসিলাহ

মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ-এর ৩৭তম বার্ষিক ইজতেমা-২০১৫

মহান আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে ও হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর সদয় অনুমোদনক্রমে আগামী ২৪, ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ-এর ৩৭তম বার্ষিক ইজতেমা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর কেন্দ্র দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। উক্ত ইজতেমার প্রথম অধিবেশন ২৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল ১০.০০ ঘটিকায় শুরু হবে।

আনসারুল্লাহ্-র ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে এবারের ইজতেমা বিশেষ মাত্রা লাভ করবে, ইনশাআল্লাহ।

ইজতেমায় সকল আনসারুল্লাহ সদস্যদের যোগদান করার আহ্বান জানাচ্ছি, সেই সাথে ইজতেমার সার্বিক সফলতার জন্য সকলের কাছে বিশেষভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

সদর
মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ

জুমুআর খুতবা

বরকতময় হল্যান্ড এবং জার্মানী সফরের বর্ণনা

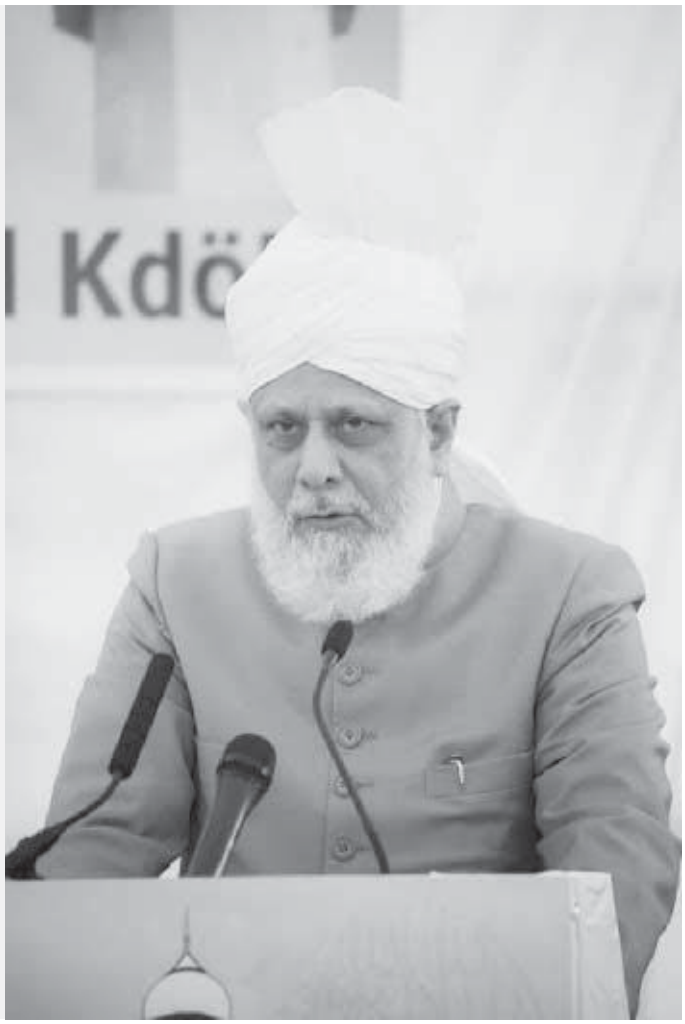

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৩ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, এটি খোদা তা'লার অপার অনুগ্রহ ও কৃপা, প্রতিটি সফরে তিনি স্বীয় সমর্থন এবং শক্তির নিদর্শন প্রকাশ করেন। অনেক সময় চিন্তা হয়, কোন কোন জামাত কোন অনুষ্ঠান আয়োজনের অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও এমন অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্যোগ নিয়ে থাকে যা পূরোপূরী জামাতের নিয়ন্ত্রণে থাকে না বরং বাইরের লোকদের সমন্বয়ে তা হয়ে থাকে। আর বাইরের লোকদের সমন্বয়ে যেসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হাতে নেয়া হয় তার জন্য তাদের বিভিন্ন মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে প্রচারণাও চালাতে হয়। এ কারণে এই চিন্তাও থাকে যে, জামাত বিরোধী কিছু দুস্কৃতিকারী অনুষ্ঠানে কোথাও আবার অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির অবতারণা না করে।

এছাড়া (এই চিন্তাও থাকে) কোনভাবে যদি অনুষ্ঠান নিম্নমানের হয় তাহলে তা আবার কোথাও শত্রুর হাসি ঠাট্টার কারণ না হয়ে যায়। যাহোক এমন অনেক দুঃশ্চিন্তা মাথায় দানা বাধে কিন্তু আমরা খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের শক্তি রাখি না কারণ তিনি অতি আশ্চর্য জনকভাবে স্বীয় সাহায্য ও সমর্থনের নিদর্শন প্রকাশ করেন, এমন নিদর্শন যা দেখে মানুষ আশ্চর্য হয়ে যায় আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি প্রদত্ত খোদার প্রতিশ্রুতি প্রত্যেকবার এক নতুন মহিমায় প্রকাশ পায় বা নতুন মহিমায়

পূর্ণ হতে দেখা যায় বরং অনেক সময় অ-আহমদীদের মতামত এবং অভিব্যক্তি এমনভাবে প্রকাশ পায় বা তারা এসব অনুষ্ঠানের জন্য এতটা সাধুবাদ জানায় যে, আমরা ভাবতে বাধ্য হই বা আমাদের ব্যবস্থাপকদেরই বিশ্বাস হয় না যে, আমরা কি সত্যিই এমন অনুষ্ঠান করেছি বা এমন মানের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হাতে নিয়েছিলাম যে কারণে বাইরের লোকেরা পর্যন্ত এভাবে প্রশংসা করছে! আর এই প্রশংসা নিছক বাহ্যিকভাবে নয় বরং মনে হয় যেন বহিরাগত অতিথিদের এই আবেগ এবং অনুভূতি তাদের হৃদয় থেকে উদ্ভূত হচ্ছে। তাদের চোখ এবং তাদের চেহারা প্রকাশ করে, তারা যা কিছু বলছে তা তাদের হৃদয়েরই প্রতিধ্বনি। আর এ সবকিছু দেখে মানুষের হৃদয় খোদা তা'লার প্রশংসার প্রেরণায় ভরে যায়, খোদা তা'লা দুর্বলতা ঢেকে রেখেছেন আর অনুষ্ঠান সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে।

সম্প্রতি আমি হল্যান্ড এবং জার্মানীর সফরে ছিলাম। জার্মানীতে আমাদের বেশ বড় জামাত রয়েছে আর খোদার অপার অনুগ্রহে খুবই সুশৃঙ্খল-সুসংগঠিত আর সব শ্রেণীর মানুষের সাথে জামাতের সদস্যদের সুসম্পর্ক আছে। প্রচার মাধ্যমও তাদেরকে ভালো কভারেজ দেয় এবং তারা তাদেরকে ভালোভাবে চেনে-জানে। কোন কোন পত্রিকা বা অন্যান্য প্রচার মাধ্যম জামাতের উন্নতি দেখে জামাত সম্পর্কে নেতিবাচক সংবাদও প্রচার করে থাকে বা সচরাচর কিছু রাজনীতিবিদ যারা এশিয়ান বংশোদ্ভূত, তারা তাদের সস্তা জনপ্রিয়তার লোভে বিভিন্ন সময় সেখানে জামাতের বিরুদ্ধে পরিকল্পনাও হাতে নিয়ে থাকে। কিন্তু মোটের ওপর জার্মান রাজনীতিবিদ এবং শিক্ষিত জার্মান সমাজ আর জার্মান নাগরিক যারা কোন না কোনভাবে জামাতের সাথে পরিচিত বা জামাতকে জানে তারা জামাত সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখে আর এ কারণে ইসলামের সত্যিকার চিত্রও তাদের সামনে ফুটে উঠে। অতএব এটিও ইসলাম এবং আহমদীয়াতের পরিচিতির একটি মাধ্যম যা আহমদীরা জার্মানীতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে করছে, সেখানে জামাতের বাইরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। কিন্তু হল্যান্ডে জামাতও ছোট আর আজ পর্যন্ত তারা এত সক্রিয়ভাবে চেষ্টাও করেনি যারফলে প্রচার মাধ্যমের সুবাদে দেশের ব্যাপক অঞ্চলে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের পরিচিতি ছড়িয়ে পড়তো। এছাড়া সংসদ সদস্য এবং শিক্ষিত শ্রেণী এবং কূটনীতিবিদদের সাথে তাদের এমন কোন সম্পর্কও নেই যে কারণে তারা জামাতকে জানবে আর আহমদী জামাতকে ইসলামের প্রতিনিধি বলে মনে করবে। কিন্তু নূনস্পিট অঞ্চল যেখানে আমাদের কেন্দ্র রয়েছে, সেখানকার এক সাংসদের সাথে দু'তিন বছর পূর্বে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জামাত পরিচিত হয় আর তিনি আমার সাথেও হল্যান্ডের এক জলসায় মিলিত হয়েছেন, আল্লাহ্ তা'লা তার মাধ্যমে হল্যান্ডের জাতীয় সংসদে একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার সুযোগ করে দিয়েছেন। এই সাংসদ হল্যান্ড সংসদের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ছিলেন বা আছেন। যাহোক তার মাধ্যমে পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটি সংসদের একটি বিশেষ কক্ষে এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে আর আমীর সাহেব আমাকে লিখেন, এভাবে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে, আপনি (অনুগ্রহ-পূর্বক) আসুন। অতএব সে অনুযায়ী আমি গিয়েছি। আমার ধারণা ছিল, গুটিকতক ব্যক্তিই হয়তো সেখানে আসবে। জামাত যেহেতু সেখানে খুব একটা পরিচিত নয় তাই মানুষ আসবে না। এছাড়া এমন কাজের কোন অভিজ্ঞতাও এই জামাতের নেই। যাহোক খোদার বিশেষ কৃপায় হল্যান্ড জামাতের অবস্থার নিরিখে যদি একে দেখা হয় তাহলে আমার মনে হয় এটি তাদের খুব সুন্দর একটি অনুষ্ঠান হয়েছে ।

এই অনুষ্ঠানে ৮৯জন নেত্রীস্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা যোগদান করেন। ডাচ সাংসদরা ছাড়াও স্পেন, আয়ারল্যান্ড, সুইডেন, ক্রোয়েশিয়া, মন্টিনিগ্রো, আলবেনিয়া, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, বেলজিয়াম, জার্মানী, ভারত, ফিলিপাইন, ডেনমার্ক এবং সাইপ্রাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন সাংসদ, রাষ্ট্রদূত এবং অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি যেমনটি বলেছি, জার্মানী জামাতের অধিকাংশ স্থানে উচ্চপদস্থ লোকদের সাথে সু-সম্পর্ক আছে কিন্তু আজ পর্যন্ত তারাও এই পর্যায়ের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে পারেনি সেখানে। সেখানে আমাদের অনুষ্ঠান সমূহে নিঃসন্দেহে বড় বড় মানুষ যোগদান করেন এবং আমাদের সেবামূলক কর্মকান্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন, ইসলামের প্রকৃত চিত্র দেখে তারা নিজেদের ইতিবাচক মতামতও ব্যক্ত করেন কিন্তু এমন কোন অনুষ্ঠান আজ পর্যন্ত সেখানে হয়নি আর অনুষ্ঠান না করার একটি কারণ হয়তো এটিও হবে যে, জার্মানী একটি বৃহৎ দেশ আর তুলনামূলকভাবে হল্যান্ড ছোট। যাহোক হল্যান্ডের জামাত যে পদক্ষেপ নিয়েছে যে সুসম্পর্ক গড়েছে, পত্র পত্রিকার সাথে যে যোগাযোগ স্থাপন করেছে, প্রচার মাধ্যমের সাথে যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেছে আমি আশা করি একে তারা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। আজ পর্যন্ত যে কাজ তারা সম্পন্ন করেছে একেই সবকিছু ভেবে বসে থাকবে না বা এটিকেই চূড়ান্ত প্রাপ্তী মনে করবে না।

সেখানে সংসদে যে অনুষ্ঠান হয়েছে তাতে আমি প্রায় আঠারো-বিশ মিনিট পর্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে ইসলামী শিক্ষা এবং চলমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে যেসব সমস্যা রয়েছে সেগুলো তুলে ধরেছি। সচরাচর যেখানেই আমি ইসলামী শিক্ষার বরাতে এবং কুরআনী শিক্ষার আলোকে কথা বলি মানুষ মনে করে এবং পরবর্তীতে তারা বলেও থাকে, তাদের প্রশ্নের উত্তর এসে গেছে এবং পর্যাপ্ত ও সন্তোষজনক উত্তর তারা পেয়েছে। কিন্তু এখানে এই অনুষ্ঠানে তিন-চারজন সাংসদ যারা বিভিন্ন পার্টির সাথে সম্পর্ক রাখে তারা বলেন, আমরা প্রশ্ন করতে চাই। আমি বললাম, ঠিক আছে আপনারা যদি আশ্বস্ত না হয়ে থাকেন তাহলে প্রশ্ন করতে পারেন। এরফলে তারা এমন কিছু প্রশ্ন করে যা সেসব কথার পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আর এমন মনে হচ্ছিল, তারা যেন আমাকে দিয়ে একথা বলাতে চাচ্ছে বা আমি যেন কোন ক্ষেত্রে একথা বলে বসি যে, নাঊযুবিল্লাহ্ ইসলামী শিক্ষা ভ্রান্ত বা এমন কোন কথা আমার মুখ থেকে বের হওয়ার অপেক্ষায় তারা ছিল যার ফলে তারা ইসলাম সম্পর্কে মুখ খোলার সুযোগ পেত। আর আমার এই কথাটি অন্যান্য দেশ থেকে আগত সাংসদরাও অনুভব করেছেন এবং

পরবর্তীতে তারা বিভিন্নভাবে একথা স্বীকারও করেছেন, এদের দু'একজনের এই আচরণ সুস্থ্য আচরণ নয় বরং কিছু ডাচ যারা এই অনুষ্ঠান দেখছিলেন বা যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তারাও এমন আচরণে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং অনুশোচনা করেছেন। যাহোক এতে আমাদের কিছু যায় আসে না।

মানুষের ধারণা ছিল, এরা হয়তো আমাকে ক্ষেপাতে চেয়েছে। কিন্তু এটিও খোদা তা'লার অপার অনুগ্রহ, এমন সহ্য শক্তি বা ধৈর্য আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অনেক দিয়ে রেখেছেন। তাদের একজন নিজেও এটি উপলব্ধি করেছেন। তিনি পরবর্তীতে যখন আমার সাথে ছবি তুলতে আসেন তখন বলেন, যদি আমার প্রশ্ন অসৌজন্যমূলক হয়ে থাকে তাহলে প্রশ্নের জন্য আমি ক্ষমা চাচ্ছি। যাহোক এই অনুষ্ঠানের বিবরণ অতি দীর্ঘ। এমটিএ'তে আপনারা শুনেও থাকবেন, দেখেও থাকবেন বা রিপোর্ট ও প্রতিবেদনে পড়ে নিন। এখন এখানে এর সবকিছু তুলে ধরা সম্ভব নয় কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারী অতিথিবৃন্দ এবং অনুষ্ঠানের অ-আহমদী শ্রোতাদের ওপর ইসলামী শিক্ষার অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। অনেক সময় পরবর্তীতে মাথায় এমন ধারণা আসে, অমুক প্রশ্নের উত্তর এভাবে দিলে যুক্তিযুক্ত হতো কিন্তু খোদা তা'লা এমনভাবে স্বীয় অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন যে, যে উত্তরই দেয়া হয়েছে অমুসলমানদের ওপর এর খুবই ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে আর তারা স্বীকারও করেছে, এমন প্রশ্নের যে উত্তর দেয়া হয়েছে তা সর্বোত্তম উত্তর ছিল। যাহোক এটি খোদা তা'লার কাজ। তিনি হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করে এক প্রতাপ সৃষ্টি করেন, মানুষকে প্রতাপান্বিত করেন। মানবীয় চেষ্টা কিছুই করতে সক্ষম নয়।

এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হওয়া নিজেই খোদার অনুগ্রহ ও কৃপার অনেক বড় একটি নিদর্শন। নতুবা হল্যান্ড জামাত যদি বলে, কারো চেষ্টা বা প্রচেষ্টার গুণে এটি হয়েছে বা জামাতের চেষ্টায় এটি হয়েছে বা কোন ব্যক্তির প্রচেষ্টায় তা হয়েছে তাহলে সে ভুল বলবে। বরং আমার মতে তাদের অধিকাংশ একথাই বলবে, আমরা বুঝে উঠতে পারছিনা যে কীভাবে এটি সম্ভব হলো। এই অনুষ্ঠানের মানের ব্যাপারে যে-ই সাংসদ এর ব্যবস্থা করিয়েছেন তিনি পরবর্তীতে আমাদের এক আহমদীকে বলেন, প্রচার মাধ্যমে এর অনেক বেশি প্রচারণা হওয়া উচিত ছিল, অথচ আমাদের মতে অনেক হয়েছে। কিন্তু তার মতে এটি আরো বেশি হওয়া উচিত ছিল আর পূর্বেই এর শিরোনাম ছাপা উচিত ছিল যেন দেশের মানুষ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। যাহোক তিনি বলেন, আমি আশ্বস্ত হতে পারিনি, যতটা প্রচারণা হওয়া উচিত ছিল ততটা হয়নি।

ইনিই তার মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, সংসদের অনেক সদস্য আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, তুমি এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে সফল হলে কি করে? অতএব শুধু স্বজনরাই নয় বরং অন্যদের দৃষ্টিতেও ছোট একটি জামাতের এভাবে সংসদ ভবনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা অনেক কঠিন ব্যাপার ছিল। এই সংসদ সদস্য বলেন, এই অনুষ্ঠান উপস্থিতির দৃষ্টিকোণ থেকে এবং যে বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমার কাছে আশাতীতভাবে সফল হয়েছে। আমার মতে এখন এর সুদূর প্রসারী ফলাফল প্রকাশ পাবে কেননা জামাতে আহমদীয়ার ইমাম তাঁর বার্তা কার্যকরিভাবে তুলে ধরেছেন। হল্যান্ডের মানুষের ইসলামের শান্তিপ্রিয় চেহারা দেখার অধিকার রয়েছে। তাদের জন্য এই বাণীর বা এই বার্তার প্রয়োজন রয়েছে। খলীফাতুল মসীহ্‌র সাথে পার্লামেন্টে এই অনুষ্ঠান প্রথম পদক্ষেপ ছিল, আমরা এমন আরো অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করব বরং তিনি সেখানে অনুষ্ঠানের শেষের দিকে এই ভাবাবেগও প্রকাশ করেছেন। আরো অনেক সম্মানিত অতিথি এই অনুষ্ঠানের জন্য সাধুবাদ জানাতে বা প্রশংসা করতে গিয়ে ইসলামের সত্যিকার চিত্র তুলে ধরার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান।

হল্যান্ডের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রীও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের পর বেশ কিছুক্ষণ তিনি বসে ছিলেন এবং আমার সাথে কথা বলতে থাকেন। তিনি তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, আপনার বাণীর আলোকে ইসলামের প্রকৃত চেহারা দেখার সুযোগ হয়েছে। তিনি আমাকে বলেন, এখন আমার বাসনা হলো, আপনি বারবার হল্যান্ডে আসুন যেন মানুষের হৃদয় থেকে ইসলাম-ভীতি দূর হয়ে যায়। তিনি বলেন, সংসদীয় কমিটির প্রশ্নের উত্তরে আপনার প্রদত্ত উত্তর যে কোন বিবেকবান মানুষের চোখ খোলার জন্য যথেষ্ট ছিল।

স্পেনের রাষ্ট্রদূতও এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন। তিনি বলেন, বিশেষ করে জামাতে আহমদীয়ার ইমাম বাক-স্বাধীনতা, সহনশীলতা, পরমতসহিষ্ণুতা, অন্য ধর্মের জন্য সম্মান সংক্রান্ত স্পর্শকাতর প্রশ্নের যেভাবে উত্তর দিয়েছেন তা যথোচিত বা ভারসামপূর্ণ উত্তর ছিল। আর অনুষ্ঠান চলাকালে সহনশীলতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষার আলোকে যেসব কথা বর্ণনা করেছেন তা হৃদয় ছুঁয়ে যায়। আর আমি এগুলোর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাই। কেননা আন্তঃধর্মীয় সমঝোতা এবং পৃথিবীর শান্তির জন্য এমন মূল্যবোধের প্রতি খেয়াল রাখা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

স্পেনের পার্লামেন্ট সদস্য বলেন, মানবতার জন্য শান্তি, স্বাধীনতা এবং আল্লাহ্ তা'লা যিনি সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা, তাঁর প্রতি ভালোবাসার আকর্ষণীয় বার্তা শুনে আমি প্রীত হয়েছি। বিশেষ করে এমন এক বিশ্বের জন্য যেখানে যুদ্ধ এবং ধর্মের নামে কৃত অত্যাচার প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে; এমন সময় এরূপ শান্তিপূর্ণ বাণীর জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আজ সেসব মানুষ যারা শান্তি চায় এবং ধর্ম মেনে চলে তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। আমাদের মাঝে যেসব বিষয়ে বিরোধ রয়েছে সেগুলো নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে সেসব কথার প্রতি আমাদের মনোযোগ দেয়া উচিত যা আমাদের মাঝে সমমূল্যবোধের।

মন্টিনিগ্রো থেকেও তিনজন এসেছিলেন যাদের একজন জাতীয় সংসদের সদস্য। তিনি বলেন, এই অনুষ্ঠান জামাতের জন্য অনেক বড় সফলতা, কেননা তাদের ইমাম ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা খুবই চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। হল্যান্ডের সাংসদদের প্রশ্ন খুবই আক্রমণাত্মক ছিল। কিন্তু তিনি খুবই যুক্তিযুক্ত এবং সত্য-সমৃদ্ধ উত্তর দিয়েছেন। আর এথেকে বুঝা যায়, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম সাহসিকতা এবং যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে কথা বলেন। তিনি আরো

বলেন, আজকের এই বিপদ সংকুল বিশ্বে এমন অনুষ্ঠানের যারপরনাই প্রয়োজন রয়েছে।

হিউম্যান রাইট্‌স ডিফেন্সের দু'জন সদস্যও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তারাও বলেন, সংসদে যে বার্তা দেয়া হয়েছে তা সমস্ত নীতি-নির্ধারকদের কাছে পৌঁছানো উচিত।

ক্রোয়েশিয়া থেকে তাদের ক্ষমতাসীন পার্টির এক সংসদ সদস্য এসেছিলেন। তিনি বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইমাম ইসলামী শিক্ষাকে খুবই স্পষ্ট এবং কার্যকরী রূপে তুলে ধরেছেন। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই ইসলামী শিক্ষা খুবই কার্যকরী। যদি সব মুসলমান এসব শিক্ষা আন্তরিকভাবে মেনে চলে তাহলে পৃথিবী শান্তির নীড়ে পরিণত হতে পারে। তিনি আরো বলেন, বাক-স্বাধীনতা সম্পর্কে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নেতা যে দ্ব্যর্থহীন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন তা খুবই কার্যকরী ছিল, বিশেষ করে হলোকোস্ট সম্পর্কে বিভিন্ন দেশে যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এর বরাত টানা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির ভীতকে আরো সুদৃঢ় করে। তিনি আরো বলেন, যদিও পাকিস্তানে আহমদীদের ওপর যুলুম ও অত্যাচার হয়েছে তাসত্ত্বেও জামাতে আহমদীয়ার নেতা পাকিস্তানের সরাসরি সমালোচনা থেকে বিরত থাকেন এবং সুন্দরভাবে মুসলমানদের প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার ওপর আমল করার নসীহত করেন যা খুবই হৃদয়গ্রাহী ছিল। তিনি আরো বলেন, অস্ত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং আইএসের জন্য তহবিল সরবরাহ বন্ধ করা সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি তিনি তুলে ধরেছেন তা সত্যিই বাস্তবধর্মী ছিল। পৃথিবীর শক্তিশালী দেশগুলো যদি একথার ওপর আন্তরিকভাবে ও বিশ্বস্ততার সাথে আমল করে তাহলে পৃথিবী শান্তির দিকে ফিরে আসতে পারে।

সুইডেন থেকে আগত সাংসদ বলেন, বক্তৃতা খুবই উন্নত মানের, কার্যকরী ও প্রভাব-বিস্তারি ছিল। ধর্মীয় নেতা হিসেবে তিনি পৃথিবীর ক্ষমতাশালী লোকদেরকে জাগ্রত করেছেন। তার বক্তৃতায় ছিল সত্যনিষ্ঠতা, লুকানো-চাপানোর কোন চেষ্টা ছিল না। শান্তি, ন্যায় বিচার, সহনশীলতা, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কে জামাতে আহমদীয়ার ইমাম খুব সহজ ও বোধগম্য ভাষায় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং বিশ্ববাসীকে একটি বার্তা দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির সদস্যদের পক্ষ থেকে বাক-স্বাধীনতা সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর ছিল যুক্তি-সমৃদ্ধ আর অন্তঃদৃষ্টিপূর্ণ। ইহুদীদের বরাত টানার পরও তারা জামাতে আহমদীয়ার ইমামের ইশারা বুঝতে পারেনি অথচ আমাদের সুইডেনে নাযীদের ব্যাজ পরাও আইনগতভাবে নিষিদ্ধ এবং পরলে শাস্তি দেয়া হয় ও জরিমানা করা হয়।

আলবেনীয়া থেকে রাজধানী তারানার মেয়রের প্রধান উপদেষ্টা এসেছিলেন। তিনি ধর্মীয় বিষয় সংক্রান্ত কমিটির সভাপতিও ছিলেন। তিনি বলেন, আমি ভাবতেও পারতাম না জামাতে আহমদীয়া এত অসাধারণভাবে ইসলামের তবলীগ করছে। জামাতে আহমদীয়ার ইমাম খুবই উন্নত ও আকর্ষণীয়ভাবে ইসলামী শিক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর যিনি বৌদ্ধধর্ম, ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মের বিশেষজ্ঞ, তিনি তার ভাবাবেগ এবং অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম শান্তির প্রেক্ষাপটে যেভাবে ইসলামী শিক্ষা তুলে ধরেছেন এটি থেকে আমি বুঝতে পেরেছি, আমাদের আন্তঃধর্মীয় সংলাপের অনুষ্ঠানে আহমদীয়া জামাতের প্রতিনিধিত্ব অলঙ্ঘনীয় বা আবশ্যকীয়। এখন আমাদের অনুষ্ঠানে জামাতের অবশ্যই অংশ নেয়া উচিত যেন ইসলামের প্রকৃত এবং সত্যিকার চিত্র আমাদের সামনে ফুটে উঠে। এছাড়াও হল্যান্ডে চার পাঁচ দিন পর্যন্ত যেসব অনুষ্ঠান হয়েছে তাতে প্রত্যেক দিনই কোন না কোন পত্রিকা ও রেডিও এবং টেলিভিশনের প্রতিনিধিরা এসে ইন্টারভিউ নেয়। তাদের সাথে দীর্ঘ আলোচনা হয়। আধা ঘন্টা থেকে আরম্ভ করে ত্রিশ-পয়ত্রিশ বরং চল্লিশ মিনিট দীর্ঘ এক একটি সাক্ষাৎকার হয়েছে যাতে তাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পদমর্যাদা, দাবি, ইসলামী শিক্ষা, পৃথিবীর শান্তি, খিলাফত ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তীতে আপনারা পড়বেন বা দেখতে পাবেন। এর মাধ্যমে জামাত সেখানে ব্যাপক পরিসরে পরিচিতি লাভ করেছে। আর প্রফেসর সাহেবও যেভাবে বলেছেন, শিক্ষিত শ্রেণীর মাঝে এখন সে দেশেও তাদের স্বীকার করতে হচ্ছে যে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা যদি জানতে হয় তাহলে আহমদীদেরকে অবশ্যই এতে ডাকতে হবে বা এর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যেমনটি আমি সাক্ষাৎকার সম্পর্কে বলেছি, প্রথম ইন্টারভিউ ৫ই অক্টোবর নূনস্পিটের রেডিও চ্যানেল আরটিভির সাংবাদিক নিয়েছেন যা বায়তুন নূর মসজিদ থেকেই সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে আর এর লাইভ স্ট্রীম সারা পৃথিবীতে মানুষ শুনেছে। এরপর ৫ই অক্টোবর তারিখেই হল্যান্ডের একটি আঞ্চলিক টেলিভিশন চ্যানেল গিলডারল্যান্ড-এর সাংবাদিকও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছে। আর এই টিভি স্টেশনের মাধ্যমে সেই এলাকায় প্রায় বিশ লক্ষাধিক মানুষের কাছে পয়গাম বা বার্তা পৌঁছেছে বরং সেই সাংবাদিক নিজেই বলেন, এখানে আমাদের গুরুত্ব তাই যা আপনাদের দেশে বিবিসি'র গুরুত্ব অর্থাৎ আপনাদের দেশে বিবিসি'র যতটা গুরুত্ব রয়েছে এখানে আমাদের ততটাই গুরুত্ব।

এরপর ৬ই অক্টোবর হল্যান্ড-এর জাতীয় পত্রিকার সাংবাদিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। এই পত্রিকার সারকুলেশন বা প্রচার সংখ্যা যদিও কম, মাত্র পঞ্চাশ হাজার কিন্তু ইন্টারনেটে তাদের পাঠক সংখ্যা লক্ষ লক্ষ। ৭ই অক্টোবর আরেকটি আঞ্চলিক পত্রিকার সাংবাদিক আসে এবং ইন্টারভিউ নেয়। এই পত্রিকার সারকুলেশন বা প্রচার সংখ্যাও লক্ষের কাছাকাছি। এরপর ৯ই অক্টোবর হল্যান্ড-এর এক পত্রিকার সাংবাদিক ইন্টারভিউ নেয়। শোনা যায় যে, এটিও অনেক পড়া হয় এবং একটি ধর্মীয় পত্রিকাও বটে। এসব ইন্টারভিউ এবং মিডিয়ার মাধ্যমে যে কভারেজ হয়েছে তা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। আমি যেমনটি বলেছি, হল্যান্ড জামাত এই প্রথমবার এত ব্যাপক পরিসরে যোগাযোগ করেছে আর এদিক থেকে তাদের অনুষ্ঠান খুবই ভাল ছিল। হল্যান্ডের তিনটি জাতীয় এবং আঞ্চলিক পত্রিকা সফরের প্রেক্ষাপটে সংবাদ প্রচার করেছে এবং রিপোর্ট বা প্রতিবেদন ছেপেছে। ৯টি পত্রিকার ইন্টারনেট সংস্করণে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এভাবে পত্র পত্রিকার মাধ্যমে প্রায় ত্রিশ লক্ষাধিক

মানুষের কাছে পয়গাম পৌঁছেছে।

আর টিভি-রেডিও'র কথা বলেছি, এছাড়া কেপিএন টিভি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশীয় পর্যায়ে এবং ওয়েব স্ট্রিমিংয়ের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে এটি প্রচার করা হয়েছে। ন্যাশনাল বা জাতীয় রেডিও ৭ই অক্টোবর রাত নটায় সফরের প্রেক্ষাপটে পাঁচ মিনিটের অনুষ্ঠান প্রচার করেছে। এভাবে রেডিওর মাধ্যমেও প্রায় পঞ্চাশ লক্ষের কাছাকাছি মানুষ জামাতের পয়গাম বা বার্তা পেয়েছে। এরপর তাদের টিভি চ্যানেলও সফরের প্রেক্ষাপটে পাঁচ মিনিটের সংবাদ প্রচার করেছে যাতে পার্লামেন্ট এবং মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের কথা উল্লেখ করেছে। এছাড়া দেশের জাতীয় টেলিভিশনেও সংবাদ প্রচার করা হয়েছে। একইভাবে এই উভয় টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে তাদের ধারণা অনুসারে প্রায় পাঁচ মিলিয়ন বা পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত পয়গাম পৌঁছেছে। মোটের ওপর যদি দেখা হয় তাহলে প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে তাদের এই প্রথম চেষ্টায় হল্যান্ডে প্রায় আশি লক্ষ মানুষ পর্যন্ত জামাতের বার্তা বা পয়গাম পৌঁছেছে।

হল্যান্ডে জামাতের দ্বিতীয় মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর রাখারও সুযোগ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা করুন এই মসজিদের নির্মাণ কাজ যেন দ্রুত সম্পন্ন হয়। ষাট বছর পর জামাত সেখানে রীতিমত মসজিদ নির্মাণ করছে। কেন্দ্র তো আছে, দু'টি সেন্টার তারা আগেই নিয়েছিল কিন্তু রীতিমত মসজিদ ছিল না। আর সেখানে সময়ের গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা ছিল মসজিদ। মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অতিথিদের সংখ্যা ছিল ১০২জন যাদের মাঝে আলমীরে শহর যেখানে এই মসজিদ নির্মিত হচ্ছে, সেখানকার মেয়র, জজ, উকিল, ডাক্তার, প্রকৌশলী, ধর্মীয় নেত্রীবৃন্দ এবং বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর মানুষ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া আলবেনিয়া, মন্টিনিগ্রো, ক্রোয়েশিয়া, স্পেন, সুইডেন এবং সুইজারল্যান্ড-এর অতিথি যারা এক দিন পূর্বের অনুষ্ঠানে এসেছিলেন তারাও এতে অংশগ্রহণ করেছেন।

আলমীরে'র মেয়র সাহেব তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, মসজিদ সম্পর্কে আপনার কথা শুনে হৃদয়ে গভীর প্রভাব পড়েছে। আপনি যে বার্তা দিয়েছেন তা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী। আমাদের সবার সম্মিলিতভাবে এটি বাস্তবায়নের চেষ্টা করা উচিত। তিনি আরো বলেন, আমরা আশা করি মসজিদের মাধ্যমে এই শান্তির বাণী অবশ্যই প্রসার লাভ করবে।

সেখানকার স্থানীয় কাউন্সিলের একজন সদস্য বা কাউন্সিলর বলেন, সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য এটি একটি আলোকবর্তিকা। একটি রাজনৈতিক দলের নাম হলো লিবারেল পার্টি, এই দলের নেতা বলেন, মনে হয় যেন ভবিষ্যতে আপনাদের জামাতই পৃথিবীর শান্তির নিশ্চয়তা। সেখানে ন্যাশনাল মুসলিম রেডিও নামে একটি রেডিও সম্প্রচারিত হয়। যেদিন মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর রাখার প্রোগ্রাম ছিল সেদিন এই ন্যাশনাল মুসলিম রেডিও আলমীরে'র মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কে একটি সাড়ে চার মিনিটের অনুষ্ঠান প্রচার করে যাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমন সম্পর্কে আলোচনা করা হয় আর আমার সম্পর্কেও বলা হয়েছে, ইনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর খলীফা। তিনি আলমীরে'তে মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর রাখার জন্য এসেছেন। এতে সেখানে মসজিদের ভিত্তি রাখার সময় যে বক্তৃতা করা হয়েছে তার কিছু অংশও শোনানো হয়েছে। এছাড়াও মিডিয়াতে এ প্রেক্ষাপটে অনেক সংবাদ প্রচার করা হয়েছে।

এরপর জার্মানীতে দু'টি মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে। সেখানেও শহরের সম্মানিত ও শিক্ষিত শ্রেণী উপস্থিত ছিল। এখানেও বেশ ভালো অনুষ্ঠান হয়েছে। যদিও জামাত সেখানে পূর্ব থেকেই পরিচিত কিন্তু এরফলে তাদের পরিচিতি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। হল্যান্ড থেকে জার্মানী যাওয়ার পথে নর্ডহর্ন-এ মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর রাখা হয়। সেখানে একটি টেলিভিশন চ্যানেলের পক্ষ থেকে ইন্টারভিউ নেয়া হয়েছে এবং তারা এর সংবাদও প্রচার করেছে। একজন সাবেক মেয়রও সেখানে এসেছিলেন। অনুষ্ঠানের পর তিনি বলেন, আমি আমার সাথীদের বলে দিয়েছি, এই রোববারে তোমাদের চার্চ বা গির্জায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই কেননা; আমাদের যা কিছু প্রয়োজন ছিল তা তাদের খলীফা বলে দিয়েছেন।

এভাবে মানুষ মতামত ব্যক্ত করে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা সত্যিকার অর্থে তাদের হৃদয় উন্মুক্ত করুন। তারা যেন সত্যিকার অর্থে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বুঝে গ্রহণ করতে পারে। এক জার্মান মহিলা বলেন, সত্যিকার অর্থে এটি খুবই ভালো একটি অনুষ্ঠান ছিল। আমি ইসলাম সম্পর্কে বেশি কিছু জানতাম না কিন্তু আজকে যেভাবে খলীফাতুল মসীহ্ বুঝিয়েছেন আমি এর প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেছি।

আরেকজন জার্মান বলেন, আমি ক্যাথলিক ধর্মের অনুসারী। আজ আরো একটি সুন্দর ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম সম্পর্কে শিখেছি। খলীফার বক্তৃতা শুনে আমার মাঝে ইসলামের গবেষণার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি আমাদের সামনে ইসলামের সত্যিকার চিত্র সম্পর্কে অবহিত করেছেন। আমি বুঝতে পেরেছি, ইসলামের ভিত্তি হলো ভালোবাসা, স্বাধীনতা এবং শান্তির ওপর। তিনি বলেন, যে কথাটি আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে তাহলো, ইসলাম প্রতিবেশীর অধিকারের ওপর অনেক জোর প্রদান করে। আরেকজন জার্মান মহিলা বলেন, আমি ধর্ম অনুসরণ করি না আর কোন ধর্মের প্রতি আমার বিশ্বাসও নেই বরং আমি এটিও জানতাম না, পৃথিবীতে একজন খলীফা আছেন। কিন্তু আজকে যখন সেই খলীফাকে দেখলাম এবং তাঁর কথা শুনলাম, তিনি বলেন, আজ আমি এখান থেকে ইসলাম সম্পর্কে সর্বোত্তম দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ফিরে যাচ্ছি। আমি শিখেছি, মসজিদ কেবল ইবাদতের জন্য নয় বরং মানুষের সেবার জন্যও নির্মিত হয়। আমি শিখেছি, মসজিদ প্রতিবেশীর প্রতি খেয়াল রাখারও স্থান। আমি আরো শিখেছি, মসজিদ শান্তি বিস্তারের জায়গা। ইসলাম সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্ন বা ভীতি যা কোন মানুষের মাথায় থাকতে পারে, জামাতে আহদীয়ার ইমামের বক্তৃতায় তা দূরীভূত হয়।

এরপর এক অতিথি সাংবাদিক বলেন, আমার ইচ্ছা ছিল এই অনুষ্ঠানের পর আমি জামাতের ইমামের ইন্টারভিউ নিব কিন্তু খলীফাতুল মসীহ্‌র বক্তৃতা শুনে আর কোন প্রকার ইন্টারভিউর প্রয়োজন নেই কেননা; মানুষের মাথায় ইসলাম সম্পর্কে সম্ভাব্য যত ভীতি বা প্রশ্ন দেখা দিতে পারে এর

প্রত্যেকটির উত্তর খলীফাতুল মসীহ্ তাঁর বক্তৃতায় প্রদান করেছেন।

এক মহিলা বলেন, তার স্বামীও তার সাথে এসেছিল। কিন্তু তার স্ত্রী যখন তাকে বলেন, ভেতরে আস তখন তিনি বলেন, আমি ভেতরে যাব না। তাকে অর্থাৎ স্ত্রীকে মসজিদে নামিয়ে দিয়ে তিনি পার্কিং-এ চলে যান, কেননা এটি মুসলমানদের অনুষ্ঠান। তিনি বলেন, আমার মন বলছে, আজ এখানে বোমা বিস্ফোরণ হবে। তাই আমার প্রাণ আমার কাছে খুবই প্রিয়। তোমার যদি মরতে মন চায় তাহলে যাও, আমি যাচ্ছি না। তিনি অর্থাৎ সেই মহিলা বলেন, এখন আমি গিয়ে তাকে বলবো, তুমি আজ একটি সর্বোত্তম দিনের অনুষ্ঠান মিস করেছ কেননা সেখানে তো প্রেম-প্রীতি এবং ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। দেখুন! মানুষ এমন দৃষ্টিভঙ্গীও রাখে। এক জার্মান মহিলাও এই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন এবং বক্তৃতা শুনেছেন। বক্তৃতা চলাকালে প্রত্যেক কথার পর তিনি বলতে থাকেন, এটি সত্য, এটি সত্য। এরপর নিজের ভাবাবেগ ও অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, আমি প্রথমবার এই অনুষ্ঠানে এসেছি এবং আপনাদের ব্যবস্থাপনা দেখে আমি অবাক হয়েছি। আপনাদের ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি মানুষকে ভদ্র মনে হচ্ছে। মানুষের এই যে অভিব্যক্তি বা ইমপ্রেশান এগুলো আমাদের একথা স্মরণ করানোর জন্যও যে, আমাদের আচার-আচরণ সবসময় এমনই হওয়া উচিত যেন সবসময়ই আমরা ভদ্র প্রতিভাত হই, সাময়ীকভাবে নয়। এটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। তিনি বলেন, আমাকে অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে, আমরা জার্মানরা এটি হারিয়ে বসেছি অর্থাৎ যে নৈতিক শিক্ষা দেয়া হয় তা হারিয়ে বসেছি। তিনি বলেন, যে নৈতিক মূল্যবোধ আমি ঘরে বাচ্চাদের শেখাতে চাই সেসব মূল্যবোধের বিরুদ্ধে স্কুলে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে কিন্তু এখানে আমাকে মানবতার জন্য প্রকৃত সম্মান এবং শ্রদ্ধাবোধ দেখানো হয়েছে।

মানুষ মনে করে স্বাধীনতার নামে স্কুলে শিশুদের যা কিছু শেখানো হচ্ছে তা খুবই সুন্দর বা ভালো। এখানকার স্থানীয় মানুষ এসব বিষয়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধ তাই আমাদের সন্তান-সন্ততিকে ঘরে বিশেষভাবে বুঝানো উচিত, এদের সব কথা সত্য নয় বরং ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি দৃষ্টি রাখা তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ; তা পালনে যত্নবান হও।

একজন পুরুষ অতিথি বলেন, আমি এখানে এসে খুবই আনন্দিত। তিনি বলেন, খ্রিষ্টধর্ম তো মৃত ধর্ম, খোলস সর্বস্ব, তাতে কোন প্রাণ নেই। কিন্তু এখানে আমি জীবন্ত ধর্ম দেখতে পাচ্ছি। আমি যখন আফ্রিকার কথা বলেছি, সেখানে পানি পাওয়া যায় না। সেখানে একজন মহিলা উপস্থিত ছিলেন, তিনি যখন জানতে পারেন, জামাতে আহমদীয়া আফ্রিকায় পানীয় জল সরবরাহের জন্য খুবই প্রশংসনীয় কাজ করছে তখন সেই ভদ্র মহিলা তার ৭/৮ বছর বয়স্ক সন্তানের কানে কানে বলেন, পানি মোটেই নষ্ট করা উচিত নয় এবং তার সাথে আরো ৩/৪টি শিশু ছিল, তাদেরকেও তিনি ইঙ্গিতে বলছিলেন, উনার কথা শোনো যেন বুঝতে পার।

অনুরূপভাবে এক দম্পতি সেখানে বসেছিল। এক আহমদীর সাথে পর্দা সম্পর্কে তাদের বিতর্ক আরম্ভ হয়। তিনি জিজ্ঞেস করেন, মহিলারা এখানে কেন বসেনি, শুধু পুরুষদেরই কেন দেখা যাচ্ছে, মহিলাদের তাবু পৃথক কেন? তিনি যখন আমার বক্তৃতা শোনেন এবং পর্দার প্রকৃত হিকমত এবং প্রজ্ঞা কি তাও যখন তার সামনে স্পষ্ট করা হয় তখন তিনি বলেন, পাশ্চাত্যে নারীদের স্বাধীনতা কেবল বাহ্যিক স্বাধীনতা, এটি সত্যিকার বা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়। তিনি বলেন, আপনি পর্দার যে দৃষ্টিভঙ্গী আমাকে বুঝিয়েছেন তা আমি বুঝতে পেরেছি আর এতেই মহিলাদের সম্মান নিহিত। অতএব অমুসলমানরাও এখন ইসলামী শিক্ষা বুঝতে পারছে। তাই আমাদের মহিলাদের মাঝেও অনেক সময় পর্দা সম্পর্কে যে হীনমন্যতা দেখা দেয় তা হওয়া উচিত নয় বরং তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। আর কোন প্রকার কৃত্রিমতা নয় বরং বাস্তবেই এমনটি হওয়া উচিত।

এক ভদ্র মহিলা তার স্বামীর সাথে এসেছিলেন। তিনি বলেন, আজকের অনুষ্ঠানে সবকিছু আমার কাছে ভালো লেগেছে। আমি ইসলাম সম্পর্কে খুবই সমালোচনা মুখর ছিলাম বা ঔৎসুক্য রাখতাম। আজ আমি বুঝতে পেরেছি, ইসলাম কল্যাণেরই মূর্ত প্রতীক। তিনি আরো বলেন, জামাতে আহমদীয়ার ইমামের এই কথাটি আমার খুব ভালো লেগেছে, আমাদের শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করা উচিত কেননা; আমরা সবাই এক খোদারই সৃষ্টি। এসব কথার আমার ওপর সুগভীর প্রভাব পড়েছে। সেই ভদ্র মহিলার স্বামী বলেন, আমারও ঔৎসুক্য ছিল এটি জানার যে, আপনাদের খলীফা আজ কেমন কথা বলবেন। কিন্তু খলীফার কথা শুনে আমি শুধু একথাই বলব, আমি তাঁর প্রতিটি কথার সাথে একমত। এখন আমি জানতে পেরেছি, মসজিদ তো শান্তির নীড়। তিনি তাঁর বক্তৃতায় যা কিছু বলেছেন তা শান্তি সম্পর্কেই বলেছেন। মানুষের পরস্পরকে ভয় করার পরিবর্তে বিশ্বাস করা উচিত। আজ এসব কথা শুনে আমার মাঝে এই মসজিদ সম্পর্কে আর কোন ভীতি অবশিষ্ট নেই। আরো এক বন্ধু সেখানে এসেছিলেন।

তিনি বলেন, আমি নাস্তিক এবং ধর্মবিরোধী কিন্তু আপনাদের খলীফা আজ এটি প্রমাণ করেছেন, তিনি সর্বপ্রকার মানুষের জন্য সহনশীলতার বৈশিষ্ট্য রাখেন এবং তাঁর প্র্যাক্টিস বা আচরণ থেকে বুঝা যায়, ইসলাম সহনশীলতার ধর্ম। খলীফার বার্তা হলো, আমাদের পারস্পরিক মনোমালিন্য এবং ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করা উচিত। আমি একথা অস্বীকার করতে পারবো না যে, খলীফা যা কিছু বলেছেন বর্তমানে এসব কথার যারপরনাই প্রয়োজন রয়েছে।

একজন মহিলা বলেন, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম আজ যে কথাগুলো বলেছেন সেগুলোর সমধিক প্রয়োজন রয়েছে। আজ পৃথিবী বহুধা বিভক্ত, কিন্তু আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইমামের বার্তা এমন ছিল যা আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। শুধু মুসলমানদেরই নয় বরং খ্রিষ্টান, ইহুদী সবার খলীফাতুল মসীহ্‌র কথার প্রতি কর্ণপাত করা উচিত। তিনি বলেন, পুরো বক্তৃতা শুনে ইসলাম সম্পর্কে আমার নেতিবাচক ধ্যান-ধারণা পরিবর্তিত হয়ে যায় আর এখন আমার ধারণা ইতিবাচক।

এখানকার পত্র-পত্রিকায়ও সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। নর্ডহর্ন-এর একটি স্থানীয় পত্রিকা

মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর রাখার অনুষ্ঠানের বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশ করেছে। তারা লিখেছে, প্রকৃত মুসলমান শান্তি ও সমঝোতা এবং সম্প্রীতিকে উৎসাহিত করে। প্রত্যেকের দায়িত্ব হলো, প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করা। তারা আমার বক্তৃতার প্রেক্ষাপটে সংবাদ ছেপেছে আর এর সার্কুলেশন বা প্রচার সংখ্যাও অনেক। এসব পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে প্রায় তিন লক্ষ বিশ হাজার মানুষের কাছে জামাতের বার্তা পৌঁছেছে।

এরপর নর্ডহর্নস্থ মসজিদ সাদেক যেখানে অবস্থিত সেখানকার টেলিভিশন চ্যানেল দুই মিনিটের সংবাদ প্রচার করে। এরও কয়েক মিলিয়ন দর্শক রয়েছে। এছাড়া পত্র-পত্রিকাতেও সংবাদ ছেপেছে। এসব পত্র-পত্রিকার অর্থাৎ স্থানীয় পত্রিকা সমূহের সামগ্রীক সার্কুলেশন বা প্রচার সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার। আর সবচেয়ে বড় দৈনিক পত্রিকা বিল্ড-এর দু'টো আঞ্চলিক সংস্করণেও এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ভিত্তি প্রস্তর রাখার প্রেক্ষাপটে পূর্বেও এতে দু'বার সংবাদ ছেপেছিল। এছাড়া নর্ডহর্ন এর মসজিদের সংবাদ রেডিওতেও প্রচারিত হয়েছে। মোটের ওপর এই দু'টি মসজিদের সেখানে ভিত্তিপ্রস্তর রাখাসংক্রান্ত সংবাদ যে সকল পত্র-পত্রিকায় ছেপেছে এবং মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছেছে তার মোট সংখ্যা হলো প্রায় ৪ লক্ষ ৯০ হাজার। এছাড়া টেলিভিশন ও রেডিও-তে যারা দেখেছে এবং শুনেছে তাদের সংখ্যাও বেশ কয়েক মিলিয়ন হবে।

জামেয়া আহমদীয়া জার্মানীর প্রথম ক্লাস সাত বছর পড়াশুনা করে এ বছর তাদের কোর্স সম্পন্ন করেছে। ১৬জন মুরুব্বী ও মুবাল্লিগ সেখান থেকে পাশ করে বের হয়েছেন এবং তাদের বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠান ছিল। জার্মানী যাওয়ার মূল উদ্দেশ্যই ছিল এটি। ২০০৮ সনে এই জামেয়া আরম্ভ হয়েছিল জার্মানীর বাইতুস সুবুহ্ নামের ছোট্ট একটি বিল্ডিং-এর কয়েকটি কক্ষে আর এখন আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তারা রীতিমত জামেয়ার বিল্ডিং নির্মাণ করেছে যাতে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। শ্রেণী কক্ষ, হল রুম, লাইব্রেরী, হোস্টেল সব কিছুই রয়েছে; বেশ ভালো ও সুন্দর বিল্ডিং। সেখানেই তাদের সমাবর্তন অনুষ্ঠান ছিল। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এখানেও বেশ ভালো অনুষ্ঠান হয়েছে। যারা পাশ করেছেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের সঠিকভাবে ধর্মসেবার তৌফিক দান করুন এবং বিশ্বস্ততার সাথে ওয়াক্‌ফের দায়িত্ব পালনের তৌফিক দিন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

"আমাদের জামাত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার অনেক বড় বড় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কোন মানবীয় বিবেক-বুদ্ধি বা দূরদর্শিতা বা জাগতিক উপায়-উপকরণ এসব প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত আমাদের পৌঁছাতে পারবে না বা এগুলো এর মাধ্যমে পূর্ণ হতে পারে না, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং উপকরণ সৃষ্টি করবেন আর তখনই এই কাজ সাধিত হবে।"

এরপর তিনি (আ.) বলেন, "আমি জানি, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং এই জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তাঁর অনুগ্রহেই এই জামাত বৃদ্ধি ও বিস্তার ঘটছে। আসল কথা হলো, যতক্ষণ আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা না হয় কোন জাতি উন্নতি করতে পারে না আর তাদের উন্নতি বা বিস্তার সম্ভব নয়। কিন্তু যখন আল্লাহ্ তা'লা কারো জন্য কোন ইচ্ছা করেন তখন তা বীজ সদৃশ্য হয়ে যায়। যেভাবে যথাযথ সময়ের পূর্বে বীজের অঙ্কুরিত হওয়া ও উন্নতি বা বেড়ে উঠার বিষয়টি কারো পক্ষে বুঝা সম্ভব নয় সেভাবেই সেই জাতির উন্নতিকেও তারা অসম্ভব মনে করে। (অর্থাৎ যেভাবে বীজের ব্যাপারে বুঝা যায় না, তা অঙ্কুরিত হবে কি না কিন্তু যখন তা অঙ্কুরিত হয় তখনই ফুল ও ফল বহন করে অনুরূপভাবে সেই জাতির উন্নতি সম্পর্কেও মানুষ সন্দিহান থাকে যে, আদৌ হবে কি হবে না) অতএব ঐশী তকদীর যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, এটি হোক তখন সেই কাজ হওয়া আরম্ভ হয়ে যায় আর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং এটি ঐশী সিদ্ধান্ত, জামাত ইনশাআল্লাহ্ তা'লা উন্নতি করবে এবং ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে।" আর জামাতের সাথে খোদার এই ব্যবহারই আমরা সর্বত্র দেখতে পাই। যাকিছু হচ্ছে, যার রিপোর্ট আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি এগুলো সব খোদা তা'লারই কাজ। এটি কোন ব্যক্তি সত্তার বা ব্যবস্থাপনার কয়েক ব্যক্তির কোন পরাকাষ্ঠা নয় যার কারণে বলা যেতে পারে, এই অনুষ্ঠান সফল হয়েছে। তবে হ্যাঁ, ঐশী তকদীরকে বুঝে বা আঁচ করে যে প্রচেষ্টা আমাদের পক্ষে করা সম্ভব তা করা উচিত যেন আমরাও এর অংশ হতে পারি এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপাভাজন হতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সেই তৌফিক দান করুন।

জুমুআর নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযাও পড়াব যা জনাব মির্যা আযহার আহমদ সাহেবের যিনি হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর পুত্র ছিলেন। ২০১৫ সনের ১৪ই অক্টোবর তিনি ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর জীবিত পুত্রদের মাঝে তিনি শেষ স্মৃতিচিহ্ন ছিলেন যিনি ইন্তেকাল করেছেন। এর মাধ্যমে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর পক্ষ থেকে ছেলেদের যে দ্বিতীয় প্রজন্ম ছিল তার এখানেই অবসান ঘটছে আর এখন তৃতীয়, চতুর্থ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম রয়েছে। আল্লাহ্ করুন তারা যেন ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। ১৭ই অক্টোবর ১৯৩০ সনে কাদিয়ানে হযরত উম্মে নাসেরের গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। প্রারম্ভিক শিক্ষা তিনি কাদিয়ানেই পেয়েছেন এবং সেখানেই মাধ্যমিক পাশ করেন। দেশ বিভাগের পর তিনি জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হন এবং জামেয়ায় পড়ালেখা অব্যাহত রাখেন। জামেয়ার পড়াশুনা শেষ করার পর একবছর তাহরীকে জাদীদের মিশন ইনচার্জ হিসেবে কাজ করেন। এরপর ১৯৬১ সনের ২১শে অক্টোবর সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার খাযানা বিভাগে নায়েব অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) একবার বলেছিলেন, আমি চাই আমার কোন পুত্র জামাতের অর্থনৈতিক বিষয়ে সাহায্য করুক। তাই বলা হয়, এ কারণেই হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) হয়ত তাকে কোষাগারে নিযুক্ত করেছেন। তার সারা জীবন খাযানাতে সেবারত অবস্থায় অতিবাহিত হয়। ১৯৯২ সনে তিনি সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এছাড়া ফুরকান ব্যাটালিয়নেও তিনি সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। খিলাফতের সাথে তার সুগভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি আমার মামা ছিলেন কিন্তু আমার সাথে বড় শ্রদ্ধা-সম্মানের

সম্পর্ক রেখেছেন। ২০০৩ সনে প্রথম জলসায় আমি তাকে দেখেছি, মানুষের ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমার ওপর যখন তার দৃষ্টি পড়ে বা তার ওপর যখন আমার দৃষ্টি পড়ে তখন খুবই আবেগাপ্লুত হয়ে হাত উচিয়ে ভালোবাসা প্রকাশ করেন। তার চেহারায় তখন খাঁটি বিশ্বস্ততা এবং নিষ্ঠা প্রকাশ পাচ্ছিল। তিনি দরিদ্রদের লালন-পালনও করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি দয়া এবং স্নেহের আচরণ করুন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ১৯৫৬ সনে খান সাঈদ আহমদ খান সাহেবের কন্যা কায়সারা খানম সাহেবার সাথে তার বিয়ে পড়িয়েছিলেন। তার দুই ছেলে ও দুই মেয়ে রয়েছে। তার এক জামাতা ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী, তিনি রাবওয়াতে আছেন এবং আরেক জামাতা লন্ডনে থাকেন নাম হলো, ডাক্তার ইরফান সাহেব। একটি ঐতিহাসিক কথা রয়েছে তাই খুতবায় আমি তা খুতবার অংশ হিসেবে বর্ণনা করছি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তার বিয়ের খুতবায় বলেন, আজ যে নিকাহ্ পড়ানোর জন্য আমি দাঁড়িয়েছি তা আমার ছেলে মির্যা আযহার আহমদের যা মরহুম খান সাঈদ আহমদ খান সাহেবের কন্যা কায়সারা খানমের সাথে ঠিক হয়েছে। পূর্বে কায়সারা খানমের সাথে আমাদের দু'ধরণের সম্পর্ক ছিল কিন্তু আজকের বিয়ের মাধ্যমে আরো একটি তৃতীয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলো। তার সাথে একটি সম্পর্ক হলো, তিনি কর্ণেল আউসাফ আলী খান সাহেবের পৌত্রি আর কর্ণেল আউসাফ আলী খান সাহেব নবাব মুহাম্মদ আলী খান সাহেবের ভগ্নিপতি এবং খালাতো ভাই ছিলেন।

অর্থাৎ তিনি সেই ব্যক্তির ভগ্নিপতির পৌত্রি যার কাছে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) তাঁর কন্যা বিয়ে দিয়েছেন বরং পরবর্তীতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর যুগে তার পুত্রের সাথে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দ্বিতীয় মেয়েরও বিয়ে হয়েছে। দ্বিতীয় সম্পর্ক যার ভিত্তি আল্লাহ্ তা'লার একটি ইলহামের ওপর তাহলো, তিনি কপুরথলা নিবাসী খান মুহাম্মদ খান সাহেবের পুত্র আব্দুল মজিদ খান সাহেবের দৌহিত্রী এবং খান মুহাম্মদ খান সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অনেক প্রবীণ একজন সাহাবী ছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আক্ষেপের সাথে বলতে হয় আমাদের জামাত তাদের ইতিহাস স্মরণ রাখার ক্ষেত্রে খুবই আলস্য প্রদর্শন করছে। বিরল এমন কোন জাতি হবে যারা নিজের ইতিহাস স্মরণ রাখার ক্ষেত্রে এতটা আলস্য দেখাচ্ছে যতটা আমাদের জামাত প্রদর্শন করছে।

খ্রিষ্টানদের দেখ! তারা ইতিহাস স্মরণ রাখার ক্ষেত্রে এতটা আলস্য প্রদর্শন করেনি। মুসলমানরা সাহাবা (রা.)-এর জীবনাচরণ এত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এ বিষয়ে অনেক বই এমনও আছে যা বেশ কয়েক হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত। কিন্তু আমাদের জামাত জ্ঞানের আধিক্যের যুগে জন্ম নেয়া সত্ত্বেও ইতিহাস স্মরণ রাখার ক্ষেত্রে চরম আলস্য প্রদর্শন করছে। মানুষের একথা স্মরণ রাখা উচিত এবং এদিকে মনোযোগ দেয়া উচিত। পূর্বেও এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল, নিজেদের ইতিহাস, পারিবারিক ইতিহাস স্মরণ রাখার চেষ্টা করুন। সাহাবীদের উল্লেখ হওয়া চাই, তাদের সম্পর্কে লেখা উচিত। তিনি (রা.) বলেন, আমি বলেছি, খান মুহাম্মদ খান সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রবীণ সাহাবী ছিলেন।

তিনি জামাতের প্রতি এত ভালোবাসা রাখতেন যে, ১লা জানুয়ারি ১৯০৪ সনে যখন তার ইন্তেকাল হয় আর দ্বিতীয় দিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে আসেন এবং বলেন, আজ আমার প্রতি ইলহাম হয়েছে, আহলে বায়ত এর মধ্যে হতে কোন ব্যক্তির ইন্তেকাল হয়েছে। উপস্থিত লোকেরা তখন বলে, হুযূরের আহলে বায়ত তো আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ভালই আছেন, তাহলে এই ইলহাম কার সম্পর্কে? তিনি (আ.) বলেন, এই ইলহাম কপুরথলা নিবাসী খান মুহাম্মদ খান সাহেব সম্পর্কে যিনি গতকাল ইন্তেকাল করেছেন। তার সম্পর্কেই আমার প্রতি এই ইলহাম হয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'লা ইলহামে তাঁকে আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত আখ্যায়িত করেছেন। এরপর তার সম্পর্কে এই ইলহামও হয়েছে, সন্তানদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা হবে।

যাহোক হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, তার ইন্তেকালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা'লার সহমর্মিতা প্রকাশ করা আর একথা বলা যে, আহলে বায়তের মধ্য থেকে কারো ইন্তেকাল হয়েছে, এটি থেকে বুঝা যায়, খোদার পবিত্র দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অতএব কায়সারা খানমের সাথে আমাদের দ্বিতীয় সম্পর্ক হলো, তিনি সেই ব্যক্তির এক পুত্রের দৌহীত্রি যাকে আল্লাহ্ তা'লা আহলে বায়ত এর অন্তর্ভুক্ত আখ্যা দিয়েছেন। এই কথাগুলোর ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণে আমি ভাবলাম যে, কিছু অংশ বর্ণনা করা উচিত। কিছু অংশ আমার মনে হয় তাঁর স্ত্রীর ইন্তেকালের সময়ও আমি বর্ণনা করেছিলাম যা কয়েক বছর পূর্বে হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা এবং করুণা সূলভ ব্যবহার করুন এবং তার প্রিয়দের চরণে তাকে ঠাঁই দিন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে নতুন সংযোজন করা হচ্ছে যে, এখন থেকে সকল আহমদী সদস্য যারাই লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক তারা ন্যাশনাল সেক্রেটারী, ইশায়াত বরাবর লেখা পাঠাবেন। সেক্ষেত্রে নিম্ন ঠিকানায় লিখতে হবে।

বরাবর,
ন্যাশনাল সেক্রেটারী, ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালা-এ-আওহাম
(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(১৪তম কিস্তি)

তাঁরা (হযরত মসীহ্‌র আকাশে আরোহণ ও অবতরণ সম্পর্কে) যেভাবে মানেন, সকল সাহাবা কিরাম ও 'আহ্‌লি-বাইত' তথা মহানবী (সা.)-এর পরিবারবর্গও কি-না সেভাবেই মেনে এসেছেন– উলামাবৃন্দের এই দাবী সম্পূর্ণ অহেতুক এবং প্রমাণবিহীন। গুণে গুণে সবার বিশ্বাস বা অভিমত সম্পর্কে জানলে কেবল খোদা তা'লাই জানতে পারেন। কোনো মানুষ কবেই বা সকলের অভিমত ও অভিব্যক্তি লিখে কোথায় সংগ্রহ করে থাকবে, কিংবা তাঁদের সকলের কাছে শোনে কবে-ই-বা কেউ তাঁদের বিবৃতিসমূহ প্রকাশ ও প্রচার করেছেন?! এতদ্‌সত্ত্বেও যে সাহবাবীগণ সংখ্যায় দশ হাজারেরও বেশি ছিলেন, কিন্তু উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের বর্ণনাকারী যথাসম্ভব দুই কি তিনজন হতে পারেন। তদুপরি তাঁদের রিওয়ায়াতও (বর্ণিত বিষয়) সাধারণভাবে প্রমাণসিদ্ধ বলে সাব্যস্ত হয় না। কেননা ইমাম বুখারী যিনি ছিলেন হাদীস শাস্ত্রের একজন বিশেষজ্ঞ ও সুদক্ষ গবেষক, তিনি ওই সমুদয় রিওয়ায়াতকে আস্থাযোগ্য মনে করেননি। আর ইমাম বুখারীর মত হাদীস সংগ্রহে কঠোর সাধনাকারীর হাতে ভালো-মন্দ ওই যাবতীয় রিওয়ায়াত পৌঁছায় নি–এমন ধারণাও নিছক অকল্পনীয়। বরং যথার্থ ও যুক্তিসঙ্গত ঘটনা এটাই যে ইমাম বুখারী ওগুলোকে প্রামাণ্য ও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেননি। তিনি নির্ণয় ও যাচাই-বাছাইয়ে প্রত্যক্ষ করেন যে অন্যসব রিওয়ায়াত স্বীয় বাহ্যিক আকারে 'ইমামুকুম মিনকুম' সংক্রান্ত হাদীসের পরিপন্থী আর উক্ত হাদীসটি শুদ্ধতা ও প্রামাণিকতায় চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত। এ কারণে তিনি এর মর্মবিরোধী অন্য হাদীসগুলোকে আস্থার অনুপযোগী মনে করে তাঁর প্রণীত সহীহ্ হাদীস গ্রন্থটিতে স্থান দেন নি।

এখন দর্শক বা পাঠকগণ বুঝতে পারছেন যে, হযরত মসীহ্ আবশ্যকীয়ভাবে দামেস্কে অবতীর্ণ হবেন– এমর্মে 'খাইরুল-কুরূন'-এর (তথা ইসলামের প্রারম্ভিক সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর মানুষের– অনুবাদক) 'ইজমা' বা সর্বসম্মত অভিমত কখনও সাব্যস্ত হতে পারে না। কেননা শ্রেষ্ঠ হাদীসবিদ ইমাম বুখারী (মুসলিম বর্ণিত) ঐ হাদীসটি গ্রহণ করেননি। ইবনে মাজাহ্‌ও ঐ হাদীসের বিরোধী। তিনি (হযরত মসীহ্‌র অবতরণ-স্থল হিসেবে) 'বাইতুল মুকাদ্দাস' বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে কারও মুখ দিয়ে কিছু বেরুচ্ছে এবং অন্য কারও মুখ দিয়ে ভিন্ন কিছু (বর্ণিত হচ্ছে)। অতএব 'ইজমা' কোথায় (সাব্যস্ত হলো)?!

ধরুন, 'ইজমা'ও যদি অনুষ্ঠিত হতো তবুও কী-বা ক্ষতি ছিল? ঐ (যুগের) বুযুর্গাণ কবে-ই-বা দাবী করেছেন, এর চেয়ে বেশি বা ভিন্ন কোনো অর্থ হতে পারে না? বরং তাঁরা তো সুন্নত অনুমোদিত ধারায় বিস্তৃত ও বিশ্লেষণমূলক বিষয়াদিকে খোদা তা'লার (সিদ্ধান্তের) ওপর অর্পন করে এসেছেন।

তাছাড়া এ-ও আমি ভালোভাবে খোলাসা করে এসেছি, এ ভবিষ্যদ্বাণীকে কেবল বাহ্যিক শব্দাবলীর গন্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখায় বড় বড় জটিলতা ও সঙ্কট রয়েছে। আকাশ থেকে হযরত মসীহ্‌র নেমে আসার আগেই শত শত আপত্তি আপতিত হয়ে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এসব জটিলতার মধ্যে পড়ারই-বা কী দরকার? মরিয়ম পুত্র মসীহ্‌কে আকাশ থেকে নামানোর এবং নবুওয়ত থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন সাব্যস্ত করারই বা কী আবশ্যক? আর তাঁকে এভাবেও হেয়ো প্রতিপন্ন করারই-বা কী প্রয়োজন যে অন্য ব্যক্তি ইমামতি করবে আর তিনি তার পেছনে 'মুক্তাদী' (মুসল্লি) হবেন এবং অন্য ব্যক্তি তার সম্মুখে ইমামত ও খিলাফত বিষয়ে মানুষের কাছ থেকে বয়আত গ্রহণ করবে আর তিনি আক্ষেপ ভরে তাকিয়ে থাকবেন এবং সাধারণ একজন মুসলমানে পরিণত হয়ে তিনি নিজের নবুওয়তের পদ মর্যাদাও উচ্চারণ করতে পারবেন না?!

আর শির্‌কের কাছাকাছি বরং সর্বৈব শির্‌কপূর্ণ এ বাক্য কেনই-ই বা আমরা উচ্চারণ করবো যে, 'এক চোখ বিশিষ্ট (কানা) দাজ্জাল খোদা তা'লার মতো নিজ ক্ষমতায় মৃতদের জীবিত করবে? প্রকাশ্যভাবে খোদা সুলভ গুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলী নিজ সত্তায় প্রদর্শন করবে আর কেউ তাকে বলবে না, 'ওহে এক চোখ বিশিষ্ট খোদা! প্রথমে তুমি তোমার চোখ ঠিক কর'?!

যে তৌহিদ ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে সেটি কি কোনো সৃষ্ট জীবকে নিজের মাঝে ওরূপ ক্ষমতা প্রদর্শনের অনুমতি দেয়? ইসলাম কি ওরূপ মনগড়া সব বাজে বিষয়কে স্বীয় পবিত্র শিক্ষায় পদপিষ্ট করে নি? অবাক হওয়ার কথা যে, মুসলমানদের দৃষ্টিতে দাজ্জালের বাহন গাধাটিও যেন খোদাসূলভ ক্ষমতা তথা ঈশ্বরত্ব প্রকাশের অধিকারী বা ঈশ্বরত্ব প্রদর্শনে সক্ষম?! তাঁরা আরও বলেন যে, এ গাধাটির স্রষ্টা কি-না দাজ্জালই বটে। কাজেই দাজ্জাল যখন 'মুহ্‌য়ী' তথা জীবনদাতা ও 'মুমীত' তথা মৃত্যুদানকারী এবং 'খালেক' তথা স্রষ্টাও বটে, তখন তার খোদা হবার ক্ষেত্রে কী-বা কমতি থেকে গেল? তারা আবার উক্ত গাধার এই গুণ ও বৈশিষ্ট্যও তুলে ধরেন যে, সে পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে বিদ্যমান দূরত্ব একদিনে অতিক্রম করতে সক্ষম হবে।

তবে আমাদের দৃষ্টিতে দাজ্জাল শব্দটি দ্বারা উন্নত জাতিগুলোকে বোঝায় এবং গাধা বলতে তাদের আবিষ্কৃত বাহন সেই রেলগাড়িকে বোঝায়, যা পূব ও পশ্চিমের দেশগুলোর মাঝে হাজার হাজার মাইল ব্যাপী চলাচল করতে আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন।

এরপর মসীহ্‌র সম্পর্কে এটাও চিন্তা করা আবশ্যক যে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ত্রিশ বা চল্লিশ হাজার ফিট উপর-দিকে যাওয়াও যখন মৃত্যুর কারণ হয় তখন হযরত মসীহ্ এই মাটির দেহ নিয়ে আকাশে কী করে পৌঁছে গেলেন–এ ধারণা বা বিশ্বাসটির দরুন বিজ্ঞান ও দর্শন সচেতেন মানুষ কি উপহাস করবে না?

আর (হাদীসে বর্ণিত) হযরত মসীহ্‌র প্রথম ও শেষের (দু'রকম দু'টি) শারীরিক গঠন ও অবয়বের মাঝে পার্থক্যের কারণ যখন (উলামা কর্তৃক) বর্ণনা করা হয় যে বয়সের পরিবর্তনের কারণবশত অবয়বে পরিবর্তন ঘটে থাকবে- এটাও কি বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টিতে উপহাসের লক্ষস্থল হবে না?

আরেকটি বিষয় আমাদের উলামাবৃন্দের চিন্তা-ভাবনার দাবী রাখে, পবিত্র হাদীসসমূহে কেবল একজন দাজ্জালের উল্লেখ করা হয় নি, বরং বহু সংখ্যক দাজ্জাল (হবে বলে) লেখা হয়েছে এবং "লি-কুল্লি দাজ্জালিন ঈসা" ('প্রত্যেক দাজ্জালের জন্য এক ঈসা রয়েছে') এ দৃষ্টান্ত বা প্রবাদটিতে সবিশেষ চিন্তা-ভাবনা পূর্বক দৃষ্টিপাতে এ কথা সহজেই বোধগম্য হতে পারে যে, 'ঈসা' শব্দটিতে 'ঈসার সদৃশ' বোঝানো উচিত। আমার এ কথাটিকে অধিকতর সমর্থন যোগায় সেই হাদীস যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের একজন 'মসীল' বা সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী বটে। তিনি (সা.) তাকে অন্য কথায় মাহ্‌দী নামে অভিহিত করেন। কেননা এ হাদীসটিতে এমন ভাষা ও শব্দাবলী রয়েছে যাতে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীটিতে তাঁর একজন 'মসীল' বা সদৃশের সুসংবাদ দিচ্ছেন। কেননা তিনি (সা.) বলেন, সে মাহ্‌দী 'খুলক' ও 'খালক' তথা চারিত্রিক গুণে ও প্রাকৃতিক গঠনে আমারই মতো হবে– "ইউওয়াতিউ ইস্‌মুহু ইস্‌মি ওয়া ইস্‌মু আবীহি ইস্‌মা আবি" অর্থাৎ 'আমার নাম অনুযায়ী তার নাম হবে এবং আমার পিতার নামের মতো তার পিতার নাম হবে।' এখন লক্ষ্য করুন, এ হাদীসটির অন্তর্নিহিত সার-কথা এটাই যে (প্রতিশ্রুত) মাহ্‌দী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি হবেন। এমতাবস্থায় বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই অতি সহজে বুঝতে পারেন যে পবিত্র হাদীসাবলীতে যেমন মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর একজন সদৃশের উল্লেখ রয়েছে, তেমনি মসীহ্ (আ.)-এরও সদৃশের উল্লেখ রয়েছে। এটা হতে পারে না যে এক জায়গায় মহানবী (সা.)-এর সদৃশ ও প্রতিচ্ছবির উল্লেখ থাকবে এবং (অনুরূপ) আরেক জায়গায় হযরত মসীহ্ (আ.) নিজেই এসে যাবেন (বলে ধরা হবে)। 'ফাতাদাব্বারু' (–অতএব গভীরভাবে চিন্তা করুন)।

এখন এটি স্পষ্ট যে আমি ঐশীবাণী ভিত্তিক আমার আকীদা-বিশ্বাসের সপক্ষে যে পরিমাণ যৌক্তিক, ঐতিহাসিক ও শাস্ত্রীয় এবং শরীয়ত (বিধান) সম্মত দলিল-প্রমাণ লিপিবদ্ধ করেছি এসবই আমার দাবীর সত্যতা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। আর এ জায়গায় যদি বড় জোর ধরেও নেয়া হয় যে আমি উদ্ভূত সব সন্দেহ-সংশয় সার্বিক ভাবে নিরসন ও নিষ্পত্তি করতে পারি নি তবে এতেও আমার কোনো ক্ষতি নেই কেননা ঐশীবাণী ও সত্য কাশ্‌ফ বা দিব্যদর্শন আমার সপক্ষে ও সমর্থনে রয়েছে। কাজেই এটুকুই আমার জন্য যথেষ্ট। একজন প্রকৃত ধার্মিক আলেমের এটা অবশ্য-কর্তব্য হওয়া উচিত যে ওহী-ইলহাম ও কাশ্‌ফ-এর নাম শোনা মাত্র যেন নীরব হয়ে যান এবং লম্বা বিতর্ক ও বিতন্ডা থেকে নিবৃত্ত থাকেন। বিরুদ্ধ মতাবলম্বী লোকদের হাতে যদি কতক হাদীস সূত্রে কিছু দলিল-প্রমাণ থেকে থাকে তাহলে আমাদের কাছেও রয়েছে এমন শাস্ত্রীয় ও শরীয়ত (তথা কুরআন-সুন্নত) ভিত্তিক দলিল-প্রমাণ যা তাঁদের থেকে কোনো অংশে কম নয়। বরং কুরআন শরীফ আমাদের সপক্ষে রয়েছে, তাদের সপক্ষে নয়। সহীহ্ বুখারী আমাদের সপক্ষে রয়েছে। তাঁদের পক্ষ সমর্থন করে না। তা ছাড়াও যৌক্তিক দলিল-প্রমাণ যা দর্শন ও বিজ্ঞানের বাস্তব অভিজ্ঞতা লব্ধ তা সবই আমাদের সপক্ষে ও সমর্থনে রয়েছে। তাদের হাতে এগুলোর একটিও নেই। এ যাবতীয় বিষয় ছাড়াও ঐশীবাণী ও স্বর্গীয় 'কাশ্‌ফ' আমাদের বর্ণিত বিষয় ও বিবরণের সত্যতার সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। তাদের কাছে জেদ ও হটকারিতার সপক্ষে তেমন কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই।

(চলবে)

ভাষান্তর : **মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

সংশোধনী

'ইযালা-এ-আওহাম'-এর ১৩তম কিস্তির ২য় পৃষ্ঠায় ২য় কলামে "খোদা করুন পরিশেষে যদি সে-আকারে পূর্ণ না হয়"-এর পরিবর্তে "খোদা না করুন..." হবে।

একই কিস্তির ১ম কলামে "ঈমান সম্পর্কিত বিষয়াবলী কোন অংশ বিশেষ"-এর পরিবর্তে "ঈমান সম্পর্কিত বিষয়াবলী'র কোন অংশ বিশেষ" হবে। অনিচ্ছাকৃত এ ভুলের জন্য আমরা দু:খিত। সংশোধনী দু'টি ক্ষুদ্র হলেও অতি জরুরী।

-সম্পাদক

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলূল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর–৪২)

(৮) চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থাবলী থেকে পাওয়া সাক্ষ্য-প্রমাণ

"হযরত মসীহ্‌র ক্রুশীয়-মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়ার স্বপক্ষে উচ্চ-পর্যায়ের এক সাক্ষ্য হচ্ছে, চিকিৎসাশাস্ত্রের শত শত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 'মারহামে ঈসা' নামের একটি মলমের ব্যবস্থাপত্র। এটি এমন এক প্রমাণ, যা না মানলেই নয়। এ সব গ্রন্থের কোন কোনটি খ্রিষ্টানদের প্রণীত। আবার কোন কোনটির প্রণেতা মাজুসী (পার্সী) অথবা ইহুদী। আর কোন কোনটির লেখক মুসলমান। এ গ্রন্থগুলোর অধিকাংশই অতি প্রাচীন কালের। গবেষণায় জানা যায়, প্রথমত এ মলমের প্রণয়ন-পত্রটি মৌখিকভাবে মানুষের মাঝে সুখ্যাত হয়ে পড়ে। এরপর মানুষ তা লিপিবদ্ধ করে নেয়। প্রথমে হযরত মসীহ্‌র যুগেই ক্রুশীয়-ঘটনার সামান্য কিছুকাল পর রোমান ভাষায় ঔষধ-প্রণয়ন-পত্রের একটি সংকলন-গ্রন্থ প্রণীত হয়। এতে এ মলমের ব্যবস্থা-পত্র বা ফর্মূলাটি অন্তভূর্ক্ত হয়েছিল এবং এতে বলা হয়েছিল যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর ক্ষতগুলোর জন্যে এ ব্যবস্থাপত্রটি প্রস্তুত করা হয়েছিল। এরপর সেই ঔষধ-প্রণয়নপত্রের সংকলন–গ্রন্থটির বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়। অবশেষে মামুন–উর–রশিদের যুগে গ্রন্থটি আরবি ভাষায় অনূদিত হয়। খোদা তা'লার কুদরতের কী অদ্ভুত মহিমা যে, প্রত্যেক ধর্মের বিজ্ঞ-চিকিৎসাবিদ, তাঁরা খ্রিষ্টান হোন বা ইহুদী, অগ্নি–উপাসক হোন বা মুসলমান, সবাই এ মলমের-প্রণয়ন পত্রটিকে তাঁদের প্রণীত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। আর তাঁরা সবাই এ মলমের প্রণয়ন পত্রটি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্যে তাঁর হাওয়ারীগণ এটি প্রয়োগ করেছিলেন। ঐষধ পত্রের মৌলিক উপাদানাদির গুণাগুণ সংক্রান্ত পুস্তকাবলী পাঠে জানা যায়, এ মলম-প্রণয়ন পত্রটি আঘাত বা পতনজনিত ক্ষতে অত্যন্ত কার্যকর। ক্ষত থেকে প্রবাহিত রক্ত তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করে এবং এতে মস্তকি (Myrrh) অন্তর্ভুক্ত থাকায় ক্ষত-স্থানকে পচন থেকেও রক্ষা করে। এ ঔষধটি প্লেগেও ফলপ্রদ এবং সব ধরনের ফোঁড়া ও চুলকানিতেও কার্যকর। ক্রুশে ক্ষতবিক্ষত হওয়ার পরে পরে স্বয়ং হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি ঐশীবাণীর সাহায্যে, না কি কোন চিকিৎসাবিদের প্রস্তাবনায় এ মলমটি প্রস্তুত করা হয়েছিল, তা স্পষ্টভাবে জানা নেই। মলমাটির কোন কোন মৌলিক-উপাদান, বিশেষতঃ মস্তকি (Myrrh) ,যার উল্লেখ তওরাতে এসেছে , তা প্রায় অব্যর্থ ভাবে নিরাময়ের কাজ করে।

মোট কথা, এ ঐষধটি ব্যবহারে হযরত মসীহ্ (আ.)- এর ক্ষতগুলো কয়েক দিনেই ভাল হয়ে যায় এবং এত শক্তির সঞ্চয় হয় যে, তিন দিনে জেরুশালিম থেকে তিনি গালীলের দিকে সত্তর মাইল পায়ে হেঁটে যান। অতএব, এ ঔষধটির কার্যকারিতা ও গুণ সম্পর্কে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, মসীহ্ তো অন্যদের আরোগ্য করতেন, কিন্তু এ ঔষধটি মসীহ্‌কে আরোগ্য করেছিল। চিকিৎসাশাস্ত্রের যেসব গ্রন্থে এ মলমের ব্যবস্থাপত্রটি লিপিবদ্ধ রয়েছে, সংখ্যায় তা সহস্রাহিক। সেগুলোর ফিরিস্তি লিখতে পেলে তা অনেক দীর্ঘ হবে। আর যেহেতু এ ব্যবস্থা-পত্রটি ইউনানী চিকিৎসাবিদদের মাঝে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, সেহেতু আমি সবগুলো গ্রন্থের নাম লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক বলে মনে করি না, কেবল কয়েকটির নাম লিখে দিচ্ছি, যা মজুদ রয়েছে।

(বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন : হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.) রচিত পুস্তক 'মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ-)

(৯) বার্নাবাসের ইঞ্জিলের সাক্ষ্যঃ

"সম্ভবত ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত বার্নাবাসের ইঞ্জিলে লিখা আছে, মসীহ্ (আঃ) ক্রুশবিদ্ধ হন নি এবং এতে মারাও যান নি। অতএব, এ থেকে আমরা বলতে পারি, যদিও এ গ্রন্থটিকে (প্রচলিত) ইঞ্জিলগুলোর অন্তর্ভূক্ত করা হয় নি এবং কোন বিধিসম্মত সিদ্ধান্ত ছাড়াই একে অগ্রাহ্য করা হয়েছে, কিন্তু নিঃসন্দেহে এ একটি প্রাচীন গ্রন্থ এবং সেই সময়কার গ্রন্থ যখন অন্যান্য ইঞ্জিলগুলোও রচিত হয়। এ প্রাচীন গ্রন্থটিকে প্রাচীন যুগের একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ বিবেচনা করে এথেকে উপকৃত হবার অধিকার কি আমাদের নেই? অথচ এ গ্রন্থ পাঠে আমরা কি অন্তত এ কথা বলতে পারি না যে, হযরত মসীহ্

(আঃ) ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিলেন বলে তখনকার সকল মানুষ একমত ছিলেন না?" [মসীহ হিন্দুস্তান মেঁ, পৃঃ–২১ লেখক– হযরত মির্যা গোলাম আহমদ–আঃ]

(১০) কাশ্মীরে যীশুর কবরের ছবিঃ

কাশ্মীরের শ্রীনগরে হযরত ঈসা (আঃ)–এর মাযার গৃহের ভিতরের দৃশ্য ছবিতে দেখানো হয়েছে (The Telegraph Magazine, London, June 4, 1978)।

"বৌদ্ধধর্মীয় সাহিত্য থেকে একথা স্পষ্ট যে ইউস আসফ নীতিগর্ভরূপক কাহিনী বলতেন। তাঁর শিক্ষা (উপদেশাবলীকে) সুসমাচার বলে এবং তিনি ভিন্ন দেশ থেকে কাশ্মীর উপত্যকায় এসেছিলেন তাঁর লোকদেরকে একত্রিত করতে। এরপরে তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং কাশ্মীরে তাঁর কবর দেওয়া হয়েছিল। কাশ্মীরের প্রাচীন দলিল-পত্র থেকে জানা যায় যে রাজা গোপাদত্তের আমলে (৪৯-১০৯ খ্রীঃ) ইউস আসফ পবিত্র নগরী (জেরুজালেম) থেকে কাশ্মীরে এসেছিলেন ইস্রায়েলী বংশোদ্ভুতদের মাঝে তাঁর নবুয়তের দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে। এজন্য তিনি ইস্রায়েলের সন্তান য়ুসু (যীশু) নামেও পরিচিত। পবিত্র কুরআন বলে, যীশু 'ফুলফল সুশোভিত ঝর্ণা–প্রবাহিত এক মনোরম উপত্যকায় বিশ্রামলাভ করেছিলেন' (২৩ঃ৫১)। ইহা কাশ্মীর উপত্যকার একটি যথার্থ বর্ণনা। এখানেই যীশু সেই হারানো গোত্রের আবাসভূমিতে সমাদৃত হয়ে তাদের মাঝে বসবাস করেছিলেন এবং তাদের মাঝে ধর্ম প্রচার করে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার পর প্রায় ১২০ বৎসর বয়সে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। আজও কাশ্মীরের শ্রীনগর শহরে খানইয়ার মহল্লায় 'নবী ইউস আসফ' এর কবর নামে খ্যাত তাঁর কবর বর্তমান রয়েছে। সে কবর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা 'যাওজাবাল' (যার অর্থ The Honoured Tomb বা সম্মানিত কবরগাহ) হিসেবে সম্মানিত হয়ে আসছে।" [লন্ডন থেকে প্রকাশিত The Review of Religions, এপ্রিল–১৯৯০]

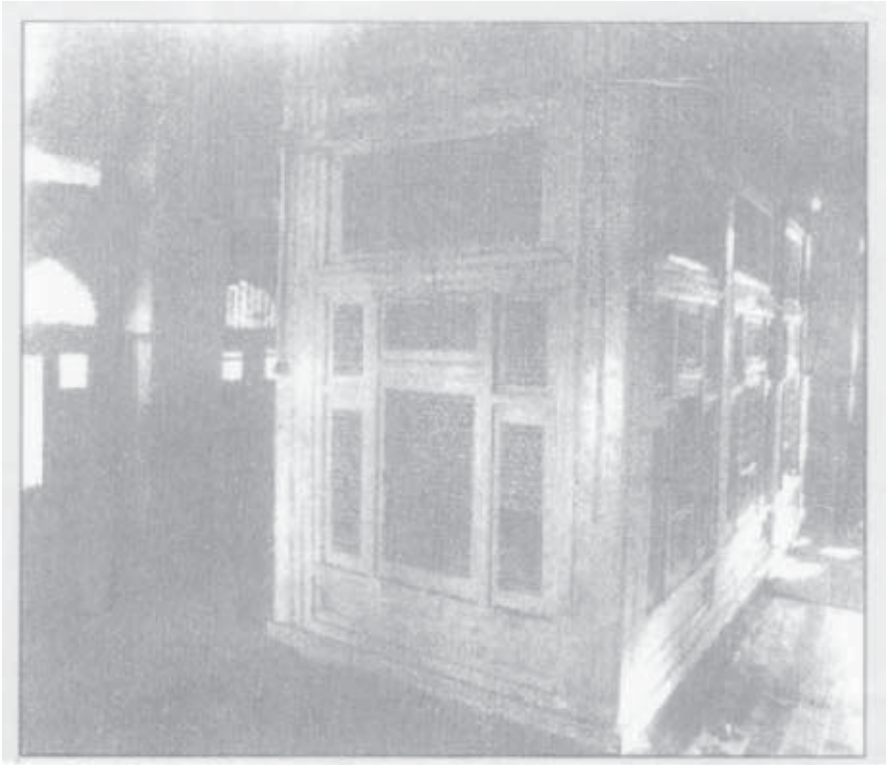

ভূস্বর্গ কাশ্মীরের শ্রীনগরে– বনী ইসরাঈলী নবী হযরত ঈসা (আ.)-এর মাযার গৃহের ভিতরের দৃশ্য ঃ উপরে– কবরের বহির্ভাগ এবং নীচে- কবরের ছবি
–দি টেলিগ্রাফ, সানডে ম্যাগাজিন, লন্ডন, ৪ জুন ১৯৭৮

কাশ্মীরে যীশুর কবরের ছবি

কলমের জিহাদঃ যীশুর মৃত্যুর প্রমাণগুলোর প্রেক্ষিতে নিখিল–বিশ্ব আহমদীয়া সংগঠনের পক্ষ থেকে বিশ্ববাসীর প্রতি আহবানঃ

পরিণত বয়সে যীশুর মৃত্যুর প্রমান দ্বারা যীশুর অভিশপ্ত মৃত্যু সংক্রান্ত ইহুদীদের অপপ্রচার এবং খ্রিষ্টানদের প্রায়শ্চিত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদ এবং মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ধ্যান-ধারনা এবং ঈসার সশরীরে–আকাশে– গমন এবং সশরীরে–পৃথিবীতে– পুনরাগমন সংক্রান্ত কল্পিত ভ্রান্ত-ধারনাগুলোর অবসান হবে। তাই যীশুর ক্রুশ থেকে অজ্ঞান অবস্থায়

পাহাড়–গুহায় অবস্থান এবং সুস্থ হয়ে গোপনে দেশত্যাগ এবং পরে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুর প্রমান গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ন। এসম্বন্ধে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের প্রমাণগুলো পরে উল্লেখ করা হবে। সেই সকল প্রমাণ এবং বাইবেলের ও ঐতিহাসিক সাক্ষ্য–প্রমাণগুলোর প্রেক্ষিতে এবং বাস্তব–সম্মত বৈজ্ঞানিক বিচার–বিশ্লেষণের আলোকে একথা স্বীকার করতেই হবে যে যীশু ঈশ্বর–পুত্র ছিলেন না এবং প্রমাণিত হবে যে, তিনি একজন নবী ছিলেন এবং অন্যান্য ইহুদী গোত্রসমূহের নিকট প্রচার কার্যের জন্য হিজরত করতঃ পরিণত বয়সে কাশ্মীরে অবস্থান কালে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন। এই প্রমাণগুলো বিশ্বব্যাপী প্রচারের জন্য শান্তিপূর্ণভাবে চেষ্টা–প্রচেষ্টা এবং কলমের জিহাদ করে চলেছে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বা সংগঠন। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে (২০১৫ সন) পৃথিবীর ২০৭টি দেশে এই সংগঠনের প্রচার কেন্দ্র রয়েছে।

যীশুখৃষ্টের পরিণত বয়সে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ, ত্রিত্ববাদের এবং প্রায়শ্চিত্তবাদের অসারতা এবং ঈসা–সদৃশ প্রতিশ্রুত মসীহ–এর আগমনের সত্যতা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কলমের জিহাদের অংশ হিসেবে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা আশিখানার অধিক পুস্তক রচনা করেছেন। (পূর্ববর্তী একটি পরিচ্ছেদে ঐসকল পুস্তকের পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে)।

*দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৮৯৯ সনে তাঁর লিখিত অন্যতম পুস্তকের নাম 'মসীহ হিন্দুস্তান মেঁ' এবং ঐ পুস্তকটিতে আলোচিত বিষয়–বস্তুর সারাংশ সম্পর্কে তিনি বলেছেনঃ

"আমি এ পুস্তকে প্রমাণ করবো, হযরত মসীহ্ (আ.) ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মারা যান নি এবং আকাশেও যান নি। আর কখনও এ আশাও করা উচিত নয় যে, তিনি আবার পৃথিবীতে আকাশ থেকে নেমে আসবেন। বরং তিনি একশ' বিশ বছর বয়সে কাশ্মীরের শ্রীনগরে ইন্তেকাল করেন। শ্রীনগরে খান ইয়ার মহল্লায় তাঁর কবর রয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে গবেষণার এ বিষয়টিকে আমি দশটি অধ্যায় ও একটি উপসংহারে বিভক্ত করেছিঃ (১) এ বিষয়ে ইঞ্জিলের সাক্ষ্য–প্রমাণ, (২) কুরআন করীম ও পবিত্র হাদীসের সাক্ষ্য–প্রমাণ, (৩) চিকিৎসা–শাস্ত্রের প্রাচীন গ্রন্থাদির সাক্ষ্য–প্রমাণ, (৪) প্রাচীন গ্রন্থাবলীর সাক্ষ্য–প্রমাণ, (৫) সেসব সাক্ষ্য–প্রমাণ যা ধারাবাহিকভাবে মুখে মুখে চলে আসছে, (৬) সর্বস্বীকৃত পারিপার্শ্বিক অবস্থাসূচক সাক্ষ্য–প্রমাণ, (৭) যুক্তিগত সাক্ষ্য–প্রমাণ, (৮) আমার প্রতি সদ্য অবতীর্ণ ঐশীবাণী (ওহী–ইলহাম) লব্ধ সাক্ষ্য–প্রমাণ–এ হলো আটটি অধ্যায়। (৯) নবম অধ্যায়ে সংক্ষেপে খ্রীষ্টধর্মের সাথে ইসলামের শিক্ষার তুলনামূলক পর্যালোচনা ও ইসলাম ধর্মের সত্যতার যুক্তি–প্রমাণ তুলে ধরা হবে। (১০) দশম অধ্যায়ে সেসব বিষয়ের কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হবে যেজন্য আল্লাহতাআলা আমাকে আদিষ্ট করেছেন এবং আল্লাহ কর্তৃক আমার প্রেরিত ও মসীহ্ মাওউদ হবার কী প্রমাণ তা বর্ণনা করা হবে। সবশেষে এ পুস্তকের উপসংহার থাকবে, যাতে কিছু জরুরী হেদায়াত ও নির্দেশনা লিপিবদ্ধ করা হবে।" [বিস্তারিত জানার জন্য পুস্তকটি দেখুন] ।

*'কিশতিয়ে নূহ' নামক পুস্তকে তিনি লিখেছেনঃ

"খুব স্মরণ রেখ যে হযরত ঈসা (আ.)–এর মৃত্যুর ঘটনা সাব্যস্ত হওয়া ভিন্ন ক্রুশ ধর্মবাদ কখনও উৎপাটিত হবে না। এমতাবস্থায় কুরআনের শিক্ষার বিরুদ্ধে তাঁকে জীবিত মনে করে কী লাভ? তাঁকে মরতে দাও, তবে খ্রিষ্টানদের জন্য একেশ্বরবাদ পুনর্জীবন লাভ করবে।"

*'হামামাতুল বুশরা' নামক পুস্তকে তিনি বলেছেনঃ "আমাদের পক্ষ থেকে খ্রিষ্টানদের ইঞ্জিল প্রত্যক্ষ করার পর এর বিবরণ হলো, ***পৌল–ই*** হলো সেই প্রথম ব্যক্তি যে খ্রিষ্টধর্মকে বিকৃত ও তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে, তাদের মূলকে বিনষ্ট করেছে। প্রকৃতপক্ষে, সে অনেক বড় ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে। সে দামেস্কে গমন করে আর সেসব খ্রিষ্টান নেতা তার সঙ্গে মিলিত হয় যারা তার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে উদাসীন ছিল, যারা ছিল বাহ্যত: স্বল্পজ্ঞানী, যাদের মতামত ছিল অগভীর আর বোধ–বুদ্ধি ছিল দুর্বল। যারা বর্ণনাকারী ও বর্ণনাকৃত বিষয় মিথ্যা ও নৈরাজ্যকর হলেও নানা ধরনের মনগড়া কথা ও আশ্চর্যজনক গল্প দ্রুত গ্রহণ করতে অভ্যস্থ ছিল।... অতএব যে ভূমিতে সর্বপ্রথম মসীহ্‌র ঈশ্বরত্বের গোড়াপত্তন হয়েছে তা হলো, দামেস্ক নগরী। আর এতে পৌল নিজ হাতে এ অপবিত্র চারাগাছগুলো রোপন করে এর অধিবাসীদের ধ্বংস করে। অতএব খ্রিষ্টানরা হচ্ছে, পৌল বপিত বীজের বৃক্ষ যা সে দামেস্কে বপন করেছে।"

*'লেকচার লুধিয়ানা' নামক পুস্তকে হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.) লিখেছেনঃ

"মুসলমানদেরকে খ্রিষ্টান বানানোর একটা অস্ত্র খ্রিষ্টানদের হাতে রয়েছে আর এটিই হচ্ছে, (ঈসা (আঃ)–এর) জীবিত থাকার বিষয়টি। তারা বলে যে, যীশুকে এই বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়েছে যিনি 'হাইয়ুন' (চিরঞ্জীবি) এবং 'কাইয়্যম' (চিরস্থায়ী) (নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক অর্থাৎ আমরা এ থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় ভিক্ষা চাই)? যীশুর জীবিত থাকার এই বিষয়টা খ্রিষ্টানদেরকে সাহসী করেছে। তারা মুসলমানদের উপর সেই আক্রমণ করেছে যার প্রতিফল সম্বন্ধে আমি তোমাদের বলেছি। এর বিপরীতে তোমরা যদি পাদ্রীদের নিকট প্রমাণ করে দাও যে, ***মসীহ্ মারা গেছে*** তবে এর ফল কী হবে? আমি বড় বড় পাদ্রীদের জিজ্ঞেস করেছি। তারা বলেছে মসীহ্ মারা গেছে এটি যদি প্রমাণ হয়ে যায় তবে খৃষ্টধর্ম জীবিত থাকতে পারে না।...যখনই আমার কোন শিষ্য এ বিষয়ে খ্রিষ্টানদের সঙ্গে আলোচনা করতে চায় তখনই তারা আলোচনা করতে অস্বীকার করে। কারণ তারা জানে এ পথে তাদের পরাজয় সন্নিকটে।"

***" আহমদীয়া ও অ–আহমদীদের মধ্যে পার্থক্য' নামক পুস্তকে তিনি বলেছেনঃ**
"একজন খ্রিষ্টানকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যদি সমস্ত লোক একত্রিত হয়ে এই বিশ্বাস পোষণ করে যে হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যু বরণ করেছেন তাহলে এর ফল কি হবে? এর উত্তর হলো, খ্রিষ্টধর্ম পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।"

(চলবে)

যে অঙ্গিকার রক্ষা করে না তার ধর্ম নেই

মাহমুদ আহমদ সুমন

‘যে ব্যক্তি বিশ্বস্ততা রক্ষা করে না তার ঈমান কোন ঈমান নয়। আর যে ব্যক্তি অঙ্গিকার রক্ষা করে না তার কোন ধর্ম নেই’

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা’লা বলেন, ‘যে লোক নিজ অঙ্গিকার পূর্ণ করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে সে-ই মুত্তাকী)। সেক্ষেত্রে নিশ্চই আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন’ (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৭৭)। ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যতম শিক্ষা হলো নিজেদের অঙ্গিকারসমূহকে যেন পূর্ণ কর হয়। তাই কুরআন শরীফের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে অঙ্গিকারসমহের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। আল্লাহপাক আমাদেরকে অঙ্গিকারপালনের যে নির্দেশ দিয়েছেন এই নির্দেশের মাঝে সমস্ত অঙ্গিকারসমূহ যেমন ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত অঙ্গিকার, অংশীদারভিত্তিক অঙ্গিকার, শপথের প্রতিশ্রুতি, দৃষ্টির প্রতিশ্রুত, শান্তি চুক্তি এবং বিয়ের অঙ্গিকার প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। আজকাল যত ধরণের ঝগড়া-বিবাদ, ফ্যাসাদ ও নৈরাজ্য সংঘটিত হচ্ছে এর মূল কারণ হচ্ছে অঙ্গিকার ভঙ্গ করা। মানুষ মুখে বলে একটা আর করে আরেকটা। কথা এবং কাজে যেহেতু মিল নাই তাই ঝগড়া-বিবাদ পিছু ছাড়ে না।

আল্লাহ্ তা’লা বলেন, ‘আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং পাকাপাকি কসম করার পর তা ভঙ্গ করো না, অথচ তোমরা আল্লাহ্‌কে জামিন করেছ। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা জানেন’ (সূরা নাহল, আয়াত: ৯২)। এরপর আবার বলছেন, ‘যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গিকারকে সুদৃঢ় করার পরও তা ভঙ্গ করে এবং যে সম্পর্ককে অটুট রাখতে আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত’ (সূরা বাকারা, আয়াত: ২৮)।

এখন কোন সম্পর্কগুলোকে আল্লাহ্ তা’লা প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন তা বুঝতে হবে। এর মধ্যে প্রধান হলো আল্লাহ্ তা’লার সাথে বিশেষ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর ইবাদত করা। সর্বদা তাঁরই সমীপে অবনত হওয়া। তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়েও তাঁর সাথে শরীক না করা। আমাদের চাকুরী, আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য, আমাদের যোগ্যতা যেন তাঁর ইবাদত থেকে বিরত না রাখে। এছাড়া নিকটাত্মীয়, বন্ধু বান্ধব, পাড়া প্রতিবেশী ও প্রিয়দের সাথেও যেন এক সুসম্পর্ক সৃষ্টি করি। এমন দৃঢ় ভালবাসা ও প্রেমের বন্ধন গড়ে তুলতে হবে যেভাবে আল্লাহ্ তা’লা প্রত্যাশা করেন। এমন যখন করবো তখন বলা যেতে পারে, আমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী। যারা সম্পর্ক ছিন্নকারী তারাই মূলত পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়। যার হৃদয়ে খোদা তা’লার প্রতি ভয় রয়েছে সে তো এই কথা শুনেই ভয়ে কেঁপে ওঠে, কারণ আল্লাহ্ তা’লা এমন ব্যক্তিদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অশনি সংবাদ দিয়েছেন। যেভাবে আল্লাহ্ বলেন, ‘আর যারা আল্লাহ্‌র (সাথে কৃত) অঙ্গিকার সুদৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ্ যে সম্পর্ক স্থাপনের আদেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়ায় এদেরই জন্য (আল্লাহ্‌র) অভিশাপ। আর এদেরই জন্য রয়েছে পরকালের নিকৃষ্ট আবাস’ (সূরা রাদ, আয়াত: ২৬)।

আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, আমরা আল্লাহ্

ও রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী এ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর জামা'তে শামিল হয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা যারা নিজেকে আহমদী বলে দাবি করি, আমরা কিন্তু বয়আতের সময় বেশ কিছু শর্তাবলী পালন করে চলবো বলে অঙ্গিকার করেছিলাম এবং সেই অঙ্গিকারগুলো নিয়মিতই করে থাকি। যেমন আমরা অঙ্গিকার করেছিলাম, কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্ক থেকে পবিত্র থাকবো, মিথ্যা, ব্যভিচার, কৃদৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম (অত্যাচার) ও খেয়ানত (আত্মসাৎ), অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হতে দূরে থাকবো। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হোক না কেন তার শিকারে পরিণত হবো না। বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রাসূল (সা.)-এর হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বো, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়বো, রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পড়বো, প্রত্যেহ নিজের পাপসমূহ ক্ষমার জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট প্রার্থনা করবো ও নিয়মিত ইস্তেগফার পড়বো, এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁর অপার অনুগ্রহ স্মরণ করে তাঁর হাম্‌দ ও তা'রিফ (প্রশংসা) করবো। উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে সাধারণতঃ আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিব না। সুখে-দুঃখে কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবো। সকল অবস্থায় তকদীরের বিধানের ওপরে সন্তুষ্টি থাকবো। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবো। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবো না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবো। সামাজিক কদাচার পরিহার করবো। কুপ্রবৃত্তির অধীন হব না। কুরআনের অনুশাসন সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করবো এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবো। অহংকার ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করবো। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার, সহিষ্ণু ও দরবেশী জীবন যাপন করবো।

ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি সহানুভূতিকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবো। আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকবো এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করবো। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস্ সালামের) সাথে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাতে অটল থাকবো। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হবে যে, কোন প্রকার পার্থিব আত্মীয়তা ও অন্যান্য সম্পর্ক এবং সেবকসূলভ অবস্থার মধ্যে এর তুলনা পাওয়া যাবে না।" প্রতিটি আহমদী এই শর্তগুলো পালন করার অঙ্গিকার করেই আহমদীয়া জামাতে প্রবেশ করেন। এখন আমাদের প্রত্যেকের আত্মজিজ্ঞাসার প্রয়োজন, আমরা কি আমাদের অঙ্গিকার পালন করছি? আমি কি শুধু নামের আহমদী? আমার দ্বারা কি অন্যের ক্ষতি হয়? আমি কি সমাজের জন্য শান্তির কারণ না অশান্তির? এছাড়া আমরা বিভিন্ন সভায় অঙ্গিকার করি যে, 'ধর্মের জন্য নিজের জান, মাল, সময় কুরবানী করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত আছি।' অথচ ব্যক্তিগত কাজকর্মেই প্রথমে আসরা প্রাধান্য দিয়ে থাকি, আর প্রতিনিয়ত অঙ্গিকার ভঙ্গ করে চলেছি। আমরা যদি আমাদের অঙ্গিকার রক্ষা না করি তাহলে আমাদের কেবল মৌখিক দাবির কোন মূল্য আল্লাহ্‌পাকের কাছে নেই। আর অঙ্গিকার রক্ষার ব্যাপারে হুযূর (আই.) প্রতিনিয়ত খুতবায় নসীহত করছেন। তিনি বার বার বলছেন, মৌখিক দাবির কোন মূল্য নেই, সমাজে আমাদেরকে উত্তম আদর্শ প্রদর্শন করতে হবে। আমরা যত ভালো কথাই বলি না কেন, আমাদের কর্ম যদি ঠিক না থাকে তাহলে কোন কথাই বা তবলীগ কাজে আসবে না। তাই আমরা যে অঙ্গিকার করেছি, তা প্রথমে বাস্তবায়ীত করতে হবে। অঙ্গিকার রক্ষার বিষয়ে হাদীসের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে।

হাদীসে এসেছে, হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি বিশ্বস্ততা রক্ষা করে না তার ঈমান কোন ঈমান নয়। আর যে ব্যক্তি অঙ্গিকার রক্ষা করে না তার কোন ধর্ম নেই' (মুসনাদ অহমদ বিন হাম্বল, ৩য় খণ্ড)। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, 'নিজ ভাইয়ের সাথে রুক্ষ আচরণ করো না এবং তার সাথে অযথা তাচ্ছিল্য করে ঠাট্টা বিদ্রুপ করো না। আর তার সাথে এমন কোনো প্রতিশ্রুতি করো না যা তুমি পূর্ণ করতে পারবে না' (আল আদাবুল মুফরিদ লি ইমামিল বুখারী)। মহানবী (সা.) বলেন, 'মুনাফিকের তিনটি লক্ষণ রয়েছে। আলাপচারিতার সময় মিথ্যাচার করে। তার কাছে যখন আমানত রাখা হয় তখন সে বিশ্বাসঘাতকতা করে। আর প্রতিশ্রুতি করলে তা ভঙ্গ করে' (বুখারী)। রাসূল করীম (সা.) অঙ্গিকার রক্ষার ক্ষেত্রে এত জোরগুরুত্বারোপ করেছেন যে, কোন কোন সময় মুসলমানদের নিদারুণ কষ্টকর সঙ্গিন অবস্থা দেখেও তিনি কখনো অঙ্গিকার ভঙ্গ করেন নি।

এক বর্ণনায় এসেছে, হুদাইবিয়ার সন্ধিতে একটি অংশ ছিল এমন যে, মক্কা থেকে যে মুসলমান হয়ে মদীনাতে চলে যাবে সে মক্কাবাসীদের বিধান অনুযায়ী তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। তো ঠিক সেই মুহূর্তে যখন সন্ধির শর্তাবলি লেখা হচ্ছিল আর শেষ দস্তখত করা হয় নি এমন সময় হযরত আবু জানদাল শিকলাবদ্ধ অবস্থায় মক্কার বন্দীশালা থেকে পালিয়ে চলে এসেছিল। আর রাসূল করীম (সা.)-এর কাছে ফরিয়াদ জানায় আর সমস্ত মুসলামানেরা এই হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখে শিউরে উঠে কিন্তু রাসূল করীম (সা.) অত্যন্ত শান্তভাবে তাকে বললেন, 'হে আবু জানদাল! ধৈর্য ধর। আমরা অঙ্গিকার ভঙ্গ করতে পারি না। আল্লাহ্ তা'লা অচিরেই তোমার জন্য কোন পথ বের করবেন' (বুখারী)।

হুদাইবিয়ার সন্ধির একটি অংশ এটাও ছিল যে, কোন মুসলমান পালিয়ে মদীনাতে চলে গেলে তাকে ফেরত পাঠানো হবে। এই অংশের ওপরে মুসলমানেরা সন্ধি বাস্তবায়নের আগেই তা পালন করে দেখিয়ে দিয়েছিল আর মক্কা থেকে পালিয়ে আগমণকারী আবু জানদালবে দ্বিতীয় বার তার বাবার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল যে তাকে আবার কষ্টদায়ক বন্দীদশায় ঠেলে দেয়। তো এই হল অঙ্গিকার রক্ষা। আল্লাহ্‌পাক আমাদের সকলকে অঙ্গিকারের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তার ওপর আমল করার এবং সত্যিকারের আহমদী হবার তৌফিক দান করুন, আমিন।

masumon83@yahoo.com

ইসলামে জন্মদিন পালন

মামুন-উর-রশীদ,
মুরব্বী সিলসিলাহ

জন্মদিন হচ্ছে পঞ্জিকা অনুযায়ী মানুষের জন্মগ্রহণের দিবস। জন্মবার্ষিকীতে কারো জন্মদিন উৎসবের মাধ্যমে পালন করা হয়। সাধারণতঃ বছরের একটি নির্দিষ্ট মাসের নির্দিষ্ট তারিখে শিশুর পক্ষে তাঁর পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন কিংবা ব্যক্তি কর্তৃক উদযাপিত হয় এই দিবসটি। অর্থাৎ, বছরের নির্দিষ্ট দিনে জন্মগ্রহণকারী শিশু বা ব্যক্তির জন্ম উপলক্ষে যে আনন্দঘন উৎসব-আয়োজনের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়, তা-ই জন্মদিন নামে আখ্যায়িত করা হয়। শিশুদেরকে কেন্দ্র করেই মুলতঃ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তাছাড়াও, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীসহ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরকেও জন্মদিন পালন করতে দেখা যায়। সাড়ম্বর উদযাপন ছাড়াও জন্মদিন উদযাপনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো শুভেচ্ছা জ্ঞাপন।

আসুন, এবার দেখা যাক জন্মদিন পালনের বিষয়টি কিভাবে বা কাদের থেকে এসেছে। আমাদের দেশে যেভাবে কেক কেটে জন্মদিন পালন করা হচ্ছে, এর উৎপত্তি আমাদের দেশে নয় বরং পশ্চিমাদেশে। ধারণা করা হয়, যীশু খ্রিষ্টের জন্মের বহু পূর্ব থেকে জন্মদিন, উৎসব হিসেবে পালন করা হত। ***পেগান*** সংস্কৃতির লোকেরা অদৃশ্য আত্মাকে ভয় পেত-বিশেষভাবে জন্ম দিনে। তাদের প্রায় সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে, এই অদৃশ্য আত্মারা আরো বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে যখন কোন ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে কোন পরিবর্তন আসে যেমন, বয়স বৃদ্ধি হওয়া। তাই ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে তারা এদিন ঘটা করে উদযাপন করতো । হাসি-তামাশা করে সে ব্যক্তির চার পাশ ঘিরে রাখত যাতে মন্দ-আত্মা তার কোন ক্ষতি করতে না পারে। উপহারের পরিবর্তে, পরের বারের জন্মদিনটা যেন শুভ ও মঙ্গলময় হয় সকলে সেই কামনাই করতো। জন্মদিন সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় এর সূচনা কোন মুসলিম থেকে হয়নি বরং হয়েছে ফেরাউন থেকে। বাইবেলের বুক অব জেনেসিস অর্থাৎ আদিপুস্তকে এসেছে, ***"তৃতীয় দিনটা ছিল ফেরাউনের জন্মদিন। ফেরাউন তার সব দাঁসদের জন্য ভোজের আয়োজন করলেন। সেই সময়ে ফেরাউন রুটিওয়ালা ও দ্রাক্ষারস পরিবেশককে কারাগার থেকে মুক্তি দিলেন "।*** (আদি পুস্তক, ৪০:২০) আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৩০৫০-৪০০০ (তিন হাজার পঞ্চাশ থেকে চার হাজার) বছর পূর্বের এ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইসলামে জন্মদিন পালন নিষেধ কেন?

যদিও মুসলমানদের মাঝে অনেকে ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মদে মুস্তফা (সা.) এর জন্মদিন তথা ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) পালন করে থাকে তবে প্রকৃত অর্থে ইসলামে জন্মদিন বা জন্মদিন পালন বলতে কিছু নেই। বছরের যে দিনটিতে কেউ জন্ম গ্রহণ করেছে, সেই দিনকে তার জন্য বিশেষ কোন দিন মনে করা বা এই উপলক্ষ্যে আনন্দ-ফূর্তি করা অথবা কোন আমল করার বিষয়ে কুরআন-সুন্নায় কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়না। ***'খাইরুল কুরূন'*** অর্থাৎ সাহাবী ও তাবেঈন (রা.) এর স্বর্ণযুগেও জন্মদিন পালনের কোন অস্তিত্ব ছিল না। যদি জন্মদিন বলতে ইসলামে কোন কিছু থাকত তাহলে হাদীস ও ইতিহাসের কিতাবগুলোতে সাহাবী ও তাবেঈন (রা.) এর জন্মদিন পালনের কোন না কোন ঘটনা থাকত। অথচ তাদের জন্মদিন পালনের কোন প্রমাণ কোন সূত্রেই পাওয়া যায়না। এমন কি জন্মদিনের বিশেষ কোন গুরুত্বই তাদের কাছে ছিল না। এর প্রমাণ মেলে তাদের জীবনীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে। সাহাবা ও তাবেঈন (রা.) এর জীবনীর দিকে লক্ষ্য করলে স্পষ্ট হয় যে, তারা কোন্ সনে জন্মগ্রহণ করেছেন তা কারো কারোটা জানা গেলেও কোন্ মাসের কোন্ তারিখে জন্ম করেছেন তা জানা খুবই দুস্কর।

এমনকি আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদে মুস্তফা (সা.) রবিউল আউয়াল মাসের কত তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন এটা নিশ্চিতভাবে জানা না থাকায় সীরাত প্রণেতাদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। আমাদের মাঝে অতি প্রসিদ্ধ ১২ই রবিউল আউয়ালও সর্ব সম্মত মত নয়। ইসলামে জন্মদিন পালন গুরুত্ববহন করে থাকলে কমপক্ষে সে সময় সাহাবীদের যে

ইসলামে যেহেতু জন্মদিনের কোন ভিত্তি পাওয়া যায়নি পক্ষান্তরে এটা বিধর্মীদের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় আচার হওয়ায় এটি পালন করা সম্পূর্ণরূপে বিদআত।

সকল সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের জন্ম তারিখ সংরক্ষিত থাকত। তারা জন্মদিন ঘটা করে পালন করতেন। অথচ জন্মদিন পালন তো দূরের কথা তাদের জন্ম তারিখই সংরক্ষণ করা হয়নি। এর মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত হয় জন্মদিন বলতে বর্তমানে যা বুঝায় ইসলামে এর কোন অস্তিত্বই ছিল না।

ইদানীং কালে দেখা যাচ্ছে, জন্মদিন পালন শুধু বিধর্মীদের সংস্কৃতিই নয় বরং ধর্মীয়ভাবেও এর বিশেষ প্রভাব রয়েছে। ইসলামে যেহেতু জন্মদিনের কোন ভিত্তি পাওয়া যায়নি পক্ষান্তরে এটা বিধর্মীদের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় আচার হওয়ায় এটি পালন করা সম্পূর্ণরূপে বিদআত।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে বলছেন, "আম লাহুম শুরাকা-উ শারাউ'লাহুম্ মিনাদ্দীনে মা লাম ইয়া'যাম বিহিল্লাহ" অর্থাৎ 'তাদের সমর্থনে কি এরূপ শরীক আছে যারা তাদের জন্য ধর্মের এমন কোন আদেশ জারী করেছে, যার আদেশ আল্লাহ্ দেননি?' (সূরা আশ্ শূরা:২২)। জন্মদিন পালনের মূল বিষয়টি যেহেতু বিধর্মীদের থেকে এসেছে তাই বলা যায় এর মূল জিনিসটিই ইসলামে প্রত্যাখ্যাত। তা যে কোন পদ্ধতিতেই হোক। আল্লাহ্ তা'লা ইরশাদ করেন, "ইত্তাবিউ' মা উনযিলা ইলাইকুম মির্ রাব্বিকুম ওয়া লা তাত্তাবিউ' মিন দূনিহি আওলিয়াআ কৃলিলাম্ মা তাযাক্কারুন" অর্থাৎ-'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষথেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ কর। তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য সাথীদের অনুসরণ করনা। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।' (সূরা আ'রাফ: ০৪) আল্লাহ্ তা'লা আরও বলছেন, "সুম্মা জায়ালনাকা আ'লা শারীয়াতিম্ মিনাল আমরি ফাত্তাবি'হা ওয়া লা তাত্তাবি' আহওয়াআল্লাযিনা লা ইয়া'লামুন" অর্থাৎ-'এরপর আমি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের বিশেষ বিধানের ওপর। সুতরাং আপনি এর অনুসরণ করুন, মূর্খদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেননা'। (সূরা জাসিয়া: ১৯)

হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "মান আহদাছা ফী আমরিনা হাযা মা লাইসা ফীহে ফাহুয়া রাদ্দুন" অর্থাৎ-'কেউ আমাদের এ শরীয়তে সংগত নয় এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটালে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে।' (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫৫০, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৫৮৯)। আবার হযরত ইবনে উমার (রা:) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "মান তাশাব্বাহা বিকৃওমিন ফাহুয়া মিনহুম" অর্থাৎ-'যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের অনুরূপ অবলম্বন করে, সে তাদেরই দলভুক্ত'। (সুনানে আবূ দাউদ: ৪০৩১)

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়,মানুষ অন্যের অনুকরণ করে থাকে তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা থেকে। জন্মদিন পালন যদি ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের কৃষ্টি-কালচারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কিংবা ভালোবাসা থেকে হয় তাহলে সেটা শুধু হারামের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং কুফরি পর্যন্ত পৌঁছে দিবে। (ইমদাদুল আহকাম)

জাহেলিয়াতের যুগে মদিনাবাসী যে দু'দিন জাতীয় উৎসব পালন করত তার এক দিনের নাম ছিল ***'নওরোজ'*** (নববর্ষ), আর অপটির নাম ছিল ***'মেহরেজান'***। মদিনাবাসী তাদের তদানিন্তন জাতীয় ধারণা ও বিশ্বাস, স্বভাব প্রকৃতি ও জাহেলি ঐতিহ্য অনুযায়ী এ দুটি জাতীয় উৎসব পালন করত। ইসলাম গ্রহণের পরেও কোন কোন সাহাবী পূর্বের ধর্মীয় উৎসব পালন করতেন।

এ সম্পর্কে হাদীসে আছে-হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "রাসূল করীম (সা.) যখন মদিনায় উপস্থিত হলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন, মদিনাবাসী যাদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক সাহাবী পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল, দুটি জাতীয় উৎসব পালন করছে। তারা খেল- তামাশা ও আনন্দ উৎসব করছে। তাদের এ আনন্দ অনুষ্ঠান দেখে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা যে এই দু'টি দিন জাতীয় উৎসব পালন কর, এর মৌলিকত্ব ও তাৎপর্য কি?" তারা জবাব দিল, 'ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমাদের জাহেলিয়াতের জীবনে আমরা এই উৎসব এমনই হাসি তামাশা ও আনন্দ উপভোগের মধ্য দিয়ে পালন করতাম, এখন পর্যন্ত তা-ই চলে আসছে।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের এই উৎসব দিনের বদলে তা হতে অধিকতর উত্তম দুটি দিন -***'ঈদুল ফিতর' ও 'ঈদুল আজহা'*** দান করেছেন। অতএব পূর্বের উৎসব পালন ছেড়ে দিয়ে এই দুটি দিনের নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানাদি পালন করতে শুরু কর"। (মুসনাদ আহমদ, আবু দাউদ)।

এরপর থেকে সাহাবীরা কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের ওপর আমল করা শুরু করলো যেখানে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, "হে যারা ঈমান এনেছ! যারা অস্বীকার করেছে তোমরা তাদের আনুগত্য করলে তারা তোমাদের পূর্বের অবস্থায় তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। এর ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে"। (সূরা আলে ইমরান: ১৫০)। ইসলাম স্বয়ং আরবদের সংস্কৃতিকেই বিন্দুমাত্র ছাড় না দিয়ে তাদের উৎসবকেই নিষিদ্ধ করে দিয়েছে সেখানে অন্যান্য উৎসবের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এই দু'দিন বাদে অন্য কোন উৎসব পালন করা মুসলিমদের জন্য উচিত নয়। ঈদে মিলাদুন্নবী, নববর্ষ (পহেলা বৈশাখ),

জন্মদিন, মৃত্যু বার্ষিকী, বিবাহ বার্ষিকী, সুবর্ণ জয়ন্তী (Golden Jubilee), মৃত্যুর পর চল্লিশা করা, শবে বরাত পালন করা, জুমুআতুল বিদা' ঘটা করে পালন করা বা তা যাই হোক না কেন।

জন্মদিনে সিয়াম পালন করাঃ

এখন কেউ যদি বলে আমি জন্মদিন হিসেবে শুকরিয়া স্বরূপ কিছু আমল করবো তাহলে এই ব্যাপারে ইসলাম আপনাকে অত্যন্ত সুন্দর পথের সন্ধান দিচ্ছে আর তা হলো সিয়াম পালন করা অর্থাৎ রোযা রাখা বা কৃচ্ছ্রতা সাধন।

হাদীস পাঠ করলে জানা যায়- ইমাম মুসলিম আবু কাতাদা আল-আনসারী থেকে বর্ণনা পাওয়া যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সোমবার দিনের সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি বলেন : "এ দিন আমি জন্ম গ্রহণ করেছি এবং এ দিনেই আমার ওপর ওহি নাযিল করা হয়েছে।" (মুসলিম : ১১৬২) এছাড়া তিরমিযী শরীফে আছে, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: "সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমল পেশ করা হয়, আমি চাই সিয়াম অবস্থায় আমার আমল পেশ করা হোক।" এ হাদীসের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অনুসরণে তাঁকে ভালোবেসে কোন ব্যক্তি নিজের জন্মদিনেও সিয়াম পালন করতে চাইলে তা পারবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর জন্মের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনস্বরূপ সোমবার অথবা বৃহস্পতিবার সিয়াম (রোযা) পালন করেছেন। আবার এ দিনের ফজিলতের কারণেও তিনি সিয়াম পালন করেছেন, যেমন এ দিনেই তাঁর ওপর ওহি নাযিল করা হয়েছে এবং এ দিনেই বান্দার আমল আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ করা হয়, তাই তিনি পছন্দ করেন, তাঁর আমল সিয়াম অবস্থায় পেশ করা হোক।

আর এজন্যই হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) প্রত্যেক আহমদীকে সোমবার অথবা বৃহস্পতিবার রোযা রাখার তাহরীক করেছেন। তবে মীলাদুন্নবী উপলক্ষে বছরের শুধু একটি দিন সিয়ামের জন্য নির্দিষ্ট করা বিদআত, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নত বিরোধী বরং যথাসাধ্য প্রতি সোম অথবা বৃহস্পতিবারে রোযা রাখার চেষ্টা করা উচিৎ।

চিন্তনীয় কিছু বিষয়ঃ

জন্মদিন পালন আজকাল শুধু একটি নিছক মজা-ই না বরং এটি জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। হয়ে যাচ্ছে একটি ঐতিহ্য, সাথে জাতের মাপকাঠি বিচারের একটি উপায়ও বটে। হচ্ছে প্রতিযোগিতা বা বিশেষ আয়োজন। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে একজন মুসলমান হিসেবে বলতে হয় এই দিবস পালন সম্পূর্ণ বিদআত, ক্ষেত্র বিশেষে হারাম। তবে বিদআত কে ছোট করে দেখার উপায় নেই। কারণ প্রত্যেক বিদআত দূষণীয় এবং বর্জনীয় আর এর পরিণাম সম্পর্কে বলা হয়েছে প্রত্যেক বর্জনীয় কাজ-ই জাহান্নামের আগুন।

আবার এই বিদআত এক ধরনের পূজার মত হয়ে যায় যখন মোমবাতি জ্বালিয়ে অগ্নি উপাসকদের মত সাদৃশ্যপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এটা তো গেলো একটি দিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও দেখা যায় এটা মুসলিম বাঙ্গালী সমাজের জন্যও মানানসই নয়। তবে এ নিয়ে অনেকেই অনেক ভাবে অনেক সময় অনেক রকম আলোচনা করেছে। আমার আলোচনা সেসব নিয়ে নয়। আমি শুধু বলতে চাই, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর প্রশংসার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন: "নাসারাগণ যেমন মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ.)-এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছিল, তোমরা আমার ব্যাপারে সেরূপ বাড়াবাড়ি করোনা। আমি কেবলমাত্র আল্লাহর একজন বান্দা। তোমরা আমাকে আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল বল।" তাছাড়া জন্মদিন পালন আসলে কেন বা এটা কোন্ দিক দিয়ে যুক্তিযুক্ত? বিবেক দিয়ে প্রশ্ন করবেন নিজেকে আর উত্তর নিজেই ভেবে বলবেন।

* আপনি যেদিন জন্মগ্রহণ করেছেন সেই দিন কি কখনো ফিরে আসবে বা সেই দিনের মত সময়, অবস্থান কি কখনো আসবে ?

* সবচেয়ে বড় যে কথা সেটি হল এই জন্মের ব্যাপারে কোন ব্যক্তির নিজের কোন যোগ্যতা বা ক্ষমতা নেই। একজন মা দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করে নির্মম কষ্ট সহ্য করে একটি সন্তানকে ভূমিষ্ঠ করে অথচ সেই মানুষটি পড়ে উপেক্ষিত হয় আর অন্যদেরকে নিয়ে পালন করা হয় ***"জন্মদিন"*** ।

* জন্মদিনকে একটি তারিখ বা দিনের সাথে মিলিয়ে স্মরণ করার অর্থ-টা কতটুকু অর্থবহ!

সামগ্রিক ভাবে যদি দেখা যায় তবে মূলত এটি একটি অনর্থক কাজ এছাড়া যদি কেউ চায় যে এই দিনটিকে আমি স্মরণ করতেই চাই তবে সে ছেলে অথবা মেয়েটির উচিত নিজের মা-বাবার কাছে ছুটে যাওয়া এবং মা-বাবা কে গিফট দেয়া বা তাদেরকে ধন্যবাদ জানানো সেই সাথে স্রষ্টায় আস্থাশীল হলে স্রষ্টার শুকরিয়া আদায় করা। কারণ নিজের যোগ্যতায় নয় মা-বাবার কল্যাণে স্রষ্টার সৃষ্টিতে যেহেতু পৃথিবীতে আগমন তাই দিনটি নিজের জন্য না হয়ে তাদের জন্যই হওয়া উচিত। আবার অন্যদিকে একমাত্র বাবা মা-ই এই দিনটির কথা স্মরণ করতে পারে এই ভেবে যে, আমাদের বুকের মানিক এইদিনে আমাদের বুক জুড়ে এসেছিল। যদিও প্রকৃত অর্থে জন্মদিন একটি অনাচার ধর্মীয় অনুষ্ঠান তথাপি কেউ চাইলে ওপরে উল্লিখিত দুটি কাজ করতে পারে যা কৃতজ্ঞতার দিবস হিসেবে জীবন কে সুতোর টানে আবদ্ধ রাখতে পারে।

একজন আহমদী মুসলমান হিসেবে এ কথাটুকু দিয়ে শেষ করতে চাই, জন্মদিন কোন উৎসবের দিন নয় বরং অসীম গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথে ভয়ঙ্কর সঙ্কেত দিবস। তাই হাসির মাধ্যমে উদযাপন নয়, অনুশোচনা আর ক্রন্দনের মাধ্যমে পুন্যময় জীবনের জন্য নতুন করে শপথ নিয়ে দিনটিকে অতিবাহিত করাই অধিকতর অর্থবহ হবে। এজন্যই হয়তো বিখ্যাত রাজা সোলায়মান অর্থাৎ হযরত সোলায়মান (আ.) বলেছেন,

"ভালো সুগন্ধির চেয়ে সুনাম ভালো,

জন্মের দিনের চেয়ে মৃত্যুর দিন ভালো।"

(পুরাতন নিয়ম, উপদেশক, ৭:১)

যীশুর প্রকৃত জন্ম তারিখ ও বড় দিন

জাহিদুল ইসলাম শুভ,
মুরব্বী সিলসিলাহ্

যীশু খ্রিষ্টের জন্মদিন হিসেবে ২৫ শে ডিসেম্বর তারিখটিকে শুধু খ্রিষ্টান বিশ্বই নয়, পৃথিবীর সকল ধর্মের অনুসারীরাও বিশ্বাস করে আসছে। এই দিনটি খ্রিষ্টান জগতের সর্ব মহাসমারোহে প্রতি বছর 'বড় দিন' হিসেবে পালিত হয়ে থাকে। যীশু কি আসলেই ২৫ শে ডিসেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেছিলেন? এ সম্পর্কে কুরআন বলে, "এরপর তার (মরিয়মের) প্রসব বেদনা তাকে এক খেজুর গাছের কান্ডের দিকে যেতে বাধ্য করল। সে বললো, হায়! এর পূর্বেই যদি আমি মরে যেতাম এবং সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যেতাম। তখন ফেরেশ্‌তা তাকে বলল, তুমি দুশ্চিন্তা করো না। তোমার প্রভু-প্রতিপালক তোমার পাদদেশ দিয়ে এক ঝর্ণা প্রবাহিত করেছেন। আর খেজুর গাছের ডাল ধরে তুমি নিজের দিকে ঝাঁকুনি দাও। সেটা তোমার জন্য তাজা পাকা খেজুর ঝরাবে।" (সূরা মরিয়ম : ২৪-২৬)

এই আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায় হযরত ঈসা (আ.) এর জন্ম এমন এক সময় হয়েছিল যখন জুদাইয়াতে গাছে গাছে তাজা পাকা খেজুর ছিল। এতে স্পষ্টতই প্রমাণ হয় সময়টা আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাস যা সেখানকার খেজুরের মৌসুম। আবার যেহেতু প্রবাহ ঝর্ণার কথা বলা হয়েছে, এতে বুঝা যায় সময়টা ডিসেম্বর হবে না। কেননা, ডিসেম্বরে ঐ অঞ্চল বরফে ঢাকা থাকে।

খ্রিষ্টানদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে কেবল কুরআনই ভুল প্রতিপন্ন করেনি, বরং ইতিহাস এমনকি বাইবেলের নূতন নিয়মও এই দিনটি সম্বন্ধে একমত নয়। ঈসা (আ.) এর জন্মদিন সম্বন্ধে লুক লিখেছেন, "ঐ অঞ্চলে মেষ পালকেরা মাঠে অবস্থান করছিল এবং রাত্রিকালে আপন আপন পাল চৌকি দিতেছিল"। (লুক ২ঃ৭-৮)

কিন্তু বেথেলহেম নগর যে রাজ্যের অন্তর্গত সেই শুষ্ক মরুময় জুডিয়া রাজ্যে ডিসেম্বর মাসের প্রচন্ড শীতে রাতের বেলায় রাখালদের পক্ষে মেষপাল পাহারা দেয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ তখন তাপমাত্রা এত নিচে নেমে যায় যে বরফ না পড়ে পারে না। তাছাড়া মধ্য প্রাচ্যে ঐ অঞ্চলে গরমের মৌসুমেই রাতের বেলায় মেষ চরাণো হয়ে থাকে। কারণ দিনের বেলায় প্রচন্ড রোদে উত্তপ্ত মরুভূমিতে মেষ চরাণো কখনও সম্ভব নয়।

লুকের বর্ণনার ওপর আলোচনা করতে গিয়ে বিশপ বার্নস তার "রইজ অপ খ্রিষ্টানিটি" পুস্তকের ৭৯ পৃষ্ঠায় বলেন, "এমন কোন সূত্র নেই যার মাধ্যমে ২৫ শে ডিসেম্বরকে যীশুর আসল জন্মদিন বলে বিশ্বাস করা যায়। যদি আমরা লুক বর্ণিত জন্ম বৃত্তান্তের প্রতি কোনরূপ বিশ্বাস স্থাপন করি এবং সেই সূত্রে রাতের বেলায় বেথেলহেমের নিকট মাঠে মেষপালকদের মেষ চরাণোর কথাকে বিশ্বাস করি, তাহলে অবশ্যই শীতকালে যীশুর জন্ম হয়নি। কারণ পার্বত্য এলাকা জুডিয়ায় রাতের বেলায় তাপমাত্রা এত নীচে নেমে যায় যে, তখন বরফ না পড়ে পারে না। অনেক যুক্তি তর্কের পরে মনে হয় আমাদের বড় দিন অর্থাৎ ক্রিসমাস বা খ্রিষ্টের জন্মদিন নির্ণীত হয়েছে ৩০০ খ্রিষ্টাব্দে।

বিশপ বার্নাসের এই অভিমত এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকা এবং চেম্বার্স এনসাইক্লোপেডিয়া "ক্রিসমাস" অধ্যায় কর্তৃক সমর্থিত। যেখানে বলা হয়েছে "খ্রিষ্টের জন্মের সঠিক দিন তারিখ কখনই সন্তোষজনকভাবে স্থিরকৃত হয়নি। কিন্তু গীর্জার পুরোহিতগণ ৩৪০ খ্রিষ্টাব্দে যখন এই ঘটনার স্মৃতি-তর্পন উদযাপনের দিন স্থির করলেন তখন তারা অতি বিজ্ঞজনোচিতভাবে মকর ক্রান্তিতে সূর্যের অবস্থান দিনকে নির্ধারণ করেছিলেন যে দিনটি তাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আনন্দোৎসবের দিন হিসেবে জনসাধারণের মধ্যে পূর্বাহ্নেই গভীর ভাবে রেখাপাত করেছিল। মানব-প্রণীত পঞ্জিকার পরিবর্তনের কারণে নিরক্ষরেখা থেকে সূর্যের দূরতম স্থানে অবস্থানকালে এবং খ্রিষ্টমাসের মধ্যে অল্প কদিনের তফাত হয়। (এনসাইকঃ ব্রিটঃ ১৫শ সংস্করণ, ৬৪২ পৃঃ)

দ্বিতীয়ত, মকরক্রান্তি সূর্যের জন্ম দিবস হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল এবং রোমে ২৫ শে ডিসেম্বর সূর্য দেবের জন্মতিথি উপলক্ষে পৌত্তলিক উৎসব পালিত হত। খ্রিষ্টান যাজক সম্প্রদায় এই প্রচলিত জনপ্রিয় আনন্দ উৎসবকে বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়ে এটাকে আধ্যাত্মিকতার নামে ন্যায় পরায়ণ সূর্যে দেবের উৎসব হিসেবে পালন করতে শুরু করল। (চেম্বার্স এনসাইঃ)

এনসাইক্লোপিডিয়ার এই বর্ণনাসমূহ পিক (Peake) প্রণীথ "কমেন্ট্রী অব দা বাইবেল" দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। এই গ্রন্থের ৭২৭ পৃষ্ঠায় পিক বলেন, "যীশুর জন্মের মৌসুম ডিসেম্বর নয়, আমাদের বড় দিন তুলনামূলক ভাবে পাশ্চাত্যে পরবর্তীতে প্রচলিত ঐতিহ্য।"

সাম্প্রতিকালে খ্রিষ্টান ধর্মমতের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক গবেষণা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করছে যে, ঈসা (আ.) ডিসেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন নি। ডঃ জন ডি. ডেডিস তার রচিত "ডিকশনারী অব দি বাইবেল" পুস্তকে 'বৎসর' শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, ইহুদীদের ইলুল (Elul) মাসে খেজুর পাকে এবং পিকের কমেন্টারী অব দি বাইবেল"-এর ১৭৭ পৃষ্ঠায় আমরা দেখতে পাই, ইলুল

মাস আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসেই পড়ে। ডঃ জীক আরও বলেন, জে স্টুয়ার্ট তার প্রণীত, "When did our actually live?" পুস্তকে, এংগোরা মন্দিরে রক্ষিত শীলা লিপি এবং প্রাচীন চীনের সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে খ্রিষ্টের জীবন কাহিনী সূদূর চীনে ২৫-২৮ খ্রিষ্টাব্দ সময়ে প্রাপ্ত বর্ণনার দ্বারা যুক্তির মাধ্যমে যীশুর জন্ম খ্রিষ্টপূর্ব ৮ সনে সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর বলে নির্ধারণ করেছেন এবং ২৪ খ্রিষ্টাব্দের বুধবারে, ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কথা সাব্যস্ত করেছেন। দুটি এনসাইক্লোপেডিয়ার উপরোক্ত বর্ণনা, "কমেন্টারী অব দি বাইবেল" এর উদ্ধৃতি দ্বারা সমর্থিত হওয়া এই ঘটনায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে ঈসা (আ.) ইহুদীদের ইলুল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইলুল ইংরেজী মাস আগষ্ট-সেপ্টেম্বরের সময় কালে পড়ে। যে সময় জুদাইয়াতে খেজুর পাকার মওসুম এবং তা ২৫ শে ডিসেম্বর নয় যেভাবে খ্রিষ্টান গীর্জাগুলো আমাদের বিশ্বাস করাতে চায়। পবিত্র কুরআন ও এই মতই ব্যক্ত করে। প্রকৃত ঘটনাটি হবে, ঈসা (আ.) এর জন্ম তারিখ নির্ধারণের সমস্ত গোলমাল সৃষ্টির কারণ মনে হয় হযরত মরিয়মের গর্ভধারনের তারিখ সম্পর্কে বিভ্রান্তি। নভেম্বর অথবা ডিসেম্বর মাসে মরিয়ম গর্ভধারণ করেছিলেন বলে মনে হয়। চার্য্যদের বিশ্বাস মতে মাচ বা এপ্রিল মাসে নয়। চার পাঁচ মাস গর্ভধারণের পর তা দৃষ্টি থেকে আঁড়ালে রাখা যখন সম্ভব ছিল না, তখন যোসেফের বাড়িতে চলে যাওয়ার জন্য যোসেফকে বুঝিয়ে রাজি করা হয়। এভাবেই খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকরা মরিয়মের গর্ভধারণ মার্চ-এপ্রিলে বলে থাকেন যা চার পাঁচ মাস পূর্বেই হয়েছিল।

যীশু খ্রিষ্টের জন্মদিন হিসেবে খ্রীষ্টানরা ডিসেম্বরের পুরো মাসকে 'ক্রিষ্টমাস' বলে পালন করে থাকে। কিন্তু এই মাসটি যীশুর জন্মের বহুকাল আগে থেকেই বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের নিকট আনন্দ উৎসবের মাস হিসেবে পালন হয়ে আসছে। রোমকরা এমাসে Saturnalia উৎসব পালন করত। টিউটনরা পালন করত 'ইয়ুল' উৎসব। আর ইহুদীদের বিখ্যাত 'হানুখাহ্' উৎসবটিও অনুষ্ঠিত হয়, তাদের কিসলেভ মাসের ২৫ তারিখে যা সাধারণত ডিসেম্বর মাসেই পড়ে। আর এই উপমহাদেশে ভারতের হিন্দুরা খ্রিষ্ট জন্মের বহু বছর পূর্ব থেকেই পালন করে আসছে "গীতা জয়ন্তী" উৎসব এবং মাসকে তারা কৃষ্ণমাস বলে অভিহিত করে আসছে। কারণ এই মাসে নাকি মহাভারত যুগের হিন্দু অবতার কৃষ্ণ তার প্রিয় শিষ্য অর্জুনকে গীতা উপদেশ দিয়েছিলেন। তাই হিন্দুরা কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত বলে এই মাসকে কৃষ্ণমাস নামে অভিহিত করে আসছে। তাই দেখা যাচ্ছে খ্রিষ্টানদের ক্রিষ্টমাস এবং হিন্দুদের কৃষ্ণমাস একটি অন্যটির সাথে জড়িত।

পন্ডিতরা বলেন, কৃষ্ণমাস নামটি থেকেই মূলত ক্রিস্টমাস নামটি এসেছে। কারণ কৃষ্ণের গীতা উপদেশের বহু পরে এমনকি রোম সভ্যতারও পতনের বহু পরে মাত্র চতুর্থ শতাব্দীতে এসে ২৫ শে ডিসেম্বরকে যীশু খ্রিষ্টের জন্মদিন নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তাই এটা পরিষ্কার যে ক্রিষ্টমাসের কোন অস্তিত্ব ছিলনা। কৃষ্ণমাস থেকেই ক্রিষ্টমাসের উৎপত্তি।

আমার পিতার আহমদীয়াত গ্রহণ

এনামুল হক রনি,
মোয়াল্লেম সিলসিলাহ্

খাঁটি ইসলাম তথা আহমদীয়াত লাভ করা অনেক বেশী সৌভাগ্যের বিষয়। আমাদের নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি যামানার ইমাম এর হাতে বয়আত না করে মারা যাবে সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করবে। আর এ যুগের ইমাম বা নেতা হলো হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) যিনি মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় ১৮৮৯ সনের ২৩ শে মার্চ ভারতের লুধিয়ানা শহরে তিনি (আ.) বয়আত গ্রহণের মাধ্যমে আহমদীয়া জামাতের গোড়াপত্তন করেন। আজ সারা বিশ্বে ২০৭ টি দেশে আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত। প্রতিনিয়ত এ জামাত বয়আত গ্রহণের মাধ্যমে বৃদ্ধি পাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় আমার পিতা জনাব আব্দুল নূর মোল্লার আহমদীয়াত গ্রহণ এক সৌভাগক্রমে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁর পিতার নাম সৈয়্যদ হোসাইন মোল্লা। মহারাজপুর গ্রামের কট্টর আহলে হাদীস পরিবারের লোক ছিলেন। নামায, রোযা, দাড়ি, টুপী, চুলের সুন্নতি বাবড়ী সব কিছু সমাজের বাঁধনে বাঁধা ছিল। অন্য সম্প্রদায় বা ফিরকার মসজিদে নামায পড়া, বিবাহ করানো, খাবার পানি গ্রহণ বিদআত জ্ঞান করতো। কিন্তু আমার পিতা মৌলবি-মুন্সীদের এতবেশি কড়াকড়িতেও নিজে বেশ স্বাধীনচেতা মন-মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। তাই অনেক সময় মসজিদে না গিয়ে ঘরে নামায পড়তেন আর জুমুআর নামায মসজিদে গিয়ে আদায় করতেন। মৌলবি-মুন্সীদের কথা ও কাজের অমিল পছন্দ করতেন না তাই সমাজের অনেকে আবার তাঁকে তির্যক দৃষ্টিতে দেখতেন।

সে সময় আমরা ছোট ছিলাম। আমাদের গ্রামের নূরুল ইসলাম সরকার চাচা আমাদের বাড়িতে গৃহশিক্ষক হিসাবে ছোট ভাইবোনদের পড়াতেন। হাতে বই খাতা থাকতো আর সুন্দর সুন্দর ছড়া-কবিতা লিখে তা পড়ে আমাদের শুনাতেন। তার বই পত্র পাড়ার যুবক ছেলেদের পড়তে দিত। গ্রামের লোকেরা চাচাকে খ্রিষ্টান বলে

ডাকতো। চাচার নিকট থেকেই বই পড়ে গ্রামের কতিপয় যুবক আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। কিন্তু সকলেই গোপনে অবস্থান করেন। চুপি চুপি এরা মিলিত হতো এবং একই সাথে আহমদীয়াতের প্রচার করতো। এদের মধ্যে আমার বড় ভাই জনাব নজরুল ইসলাম মোল্লা ছিল। আব্বা জানতো না যে আমার বড় ভাই আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে। সময় সময় চাচা এসব নিয়ে কথা বললে আব্বা শুনতো না বরং চাচার ওপর রাগ করতো। এভাবে গোপনে তাদের কার্যক্রম চলতে থাকে। এক পর্যায়ে আমার আরেক ভাই ইমদাদুল হক সেও আহমদীয়াত গ্রহণ করে। আব্বা তখনও জানেন না।

কিন্তু তার কিছুদিন পরে গ্রামে এদের কথা মসজিদে আলোচনা হতে থাকে। হঠাৎ কতিপয় বইপত্র আব্বার নজরে আসে। রাগ করে এসব বইপত্র ফেলে দিতে বা পুড়িয়ে দিতে চাইলে আমার মা মরহুমা খোদেজা বেগম বলেন, এসব বইতে আরবী লেখা কুরআনের আয়াত আছে, পোড়ানোর দরকার নাই। অন্য জায়গায় লুকিয়ে রাখছি যেন তারা আর না পায়। তখন আব্বা ভাইদের প্রতি রাগান্বিত হয় যে, তাদের জন্য গ্রামে অপমান হতে হচ্ছে। গ্রামের লোকজন এরা খ্রিষ্টান, বেদ্বীন, মুরতাদ, কাফের বলে ফতোয়া দিল। আব্বা তো লজ্জায় মসজিদে যেতে পারেনা। ঘরেই নামায পড়েন, জুমুআর নামায পড়তে কেবল মসজিদে যায়। তারও কিছুদিন পর মসজিদে যাওয়া ছেড়ে দিতে হলো মানুষের কথাতে।

হঠাৎ একদিন বিকালের দিকে ১৯৮৭ সালের মে মাসের শেষের দিকে তখন রমযান মাস ছিল। রমযানের শেষের দিন মহারাজপুর গ্রাম থেকে পুরুলিয়া গিয়ে মৌলবি ও মাদ্রাসার শত শত ছাত্র ও গ্রামের বখাটে ছেলেরা অতর্কিত আক্রমণ করেছে আহমদীদের মসজিদ এবং বাড়ি ঘরের ওপর। এতে আহত হয় আমার বড় ভাই সহ ৭/৮ জন। সাথে জনাব মরহুম হোসাইন মোয়াল্লেম সাহেবও আহত হন। পুরুলিয়া থেকে ৩/৪ মাইল রাস্তা, বিভৎস চিৎকার গালা-গালি করে, এদের মারতে মারতে কাউকে অজ্ঞান করা হয়, কাউকে মাটিতেও টেনে হিঁচড়ে গায়ের চামড়া উঠানো হয়। কাউকে গরুর রশি দিয়ে বেধে রাখা হয়। অবশেষে গ্রামের কিছু সচেতন মানুষ এই ভেবে যে, এরা যদি মারা যায় গ্রামের কি অবস্থা হবে, কৌশলে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। সকলকে নিয়ে নাটোর জেলা সদর হাসপাতালে যাওয়া হয়। তেবাড়িয়া জামাত এসব আহত রুগীদের দেখা শুনা ও সেবা শুশ্রূষা করেন। এর জন্য তেবাড়িয়া জামাতের দানিয়াল সাহেবের বাড়িতে রুগীরা সুস্থ হলে অবস্থান করেন। আর তাঁদের খোঁজ খবর নিতে ঢাকা কেন্দ্র থেকেও লোকজন আসেন। আমার আব্বাসহ গ্রামের আরো দুইজন মুরব্বী বয়সী জনাব আব্দুল কাদের মোল্লা ও জনাব কলিমউদ্দিন তাদের নিজ নিজ সন্তানদের দেখতে যান। হাসপাতাল ও তেবাড়িয়া জামাতের সদস্যদের চিকিৎসা সেবা দেখে তারা অভিভূত হয়ে যায়। বলেই ফেলে আমাদের নিজ সন্তানের জন্য আমরা যা করতে পারতাম না তা আপনারা করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানানোর পাশাপাশি তাদের বলেন, আপনারা ভাল মানুষ না হলে এমন মহৎ কাজ করতে পারতেন না। প্রশ্ন করেন আপনাদেরকে খ্রিষ্টান বলে কেন? আমরা তো আপনাদের নামায পড়তে দেখি আমাদের মতো। আর আপনাদের চাল-চলন বড় চমৎকার। তাহলে কেন এত বিরোধিতা? কাফের বলে কেন?

এসব কথার উত্তর শুনে জামাতের কিছু বই পত্র পড়তে থাকে। তিনজন মিলে তেবাড়িয়া জামাতে বয়আত করে আহমদীয়া জামাতভুক্ত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। সময় ১৯৮০ সনের জুন মাস। বয়আত করে বাড়ি ফিরে আসে। ইতিমধ্যে গ্রামের লোকজনের হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। একথা বলতে থাকে যে, ছেলেদের সাথে তাদের বাবারাও কাদিয়ানী খ্রিষ্টান হয়ে গেছে। গ্রামে যার সাথে দেখা হয় সালাম কালাম তো করেই না উল্টো তিরস্কার করতে থাকে। আর বলতে থাকে হায় হায় বাপ-দাদার ধর্ম নষ্ট করে এই বয়সে ছেলেদের জন্য খ্রিষ্টান কাফির, বেদ্বীন হয়ে গেল। আত্মীয়-স্বজনরা এসে বুঝাতে থাকে আপনার গ্রামের সম্মানিত মানুষ ছিলেন আর এ কি কাজ করলেন, তওবা করুন, মুসলমান হয়ে যান।

বড় চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়লেন। ঘরে বসে দোয়া করে, বই-পত্র ও কুরআন শরীফ অনুবাদসহ পাঠ করতে লাগলেন। এতে কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর পেতে থাকেন এবং মন ও ঈমান সুদৃঢ় হতে থাকে। কেন্দ্র থেকে ন্যাশনাল আমীর সাহেব দোয়া ও কুরআন পাঠ বেশি বেশি করতে পরামর্শ দেন। এর মধ্যে আত্মীয়-স্বজনদের কেউ কেউ মৌলবি ও হাজী সাহেব বুঝাতে আসলে এখন উত্তর দিতে পারেন। প্রথমে এসেই বলে তওবা করে মুসলমান হতে হবে উত্তরে তাদের সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতেন যে, আমি তো এই কলেমা পাঠ করি। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"। আপনারা আমাকে কোন্ কলেমা পড়াবেন? নামায আগের সূরা কালাম দিয়ে পশ্চিম দিক হয়ে একই নিয়মে রাকাত ঠিক রেখে পড়ি। এই দেখুন কুরআন মজীদে লেখা আছে হযরত ঈসা (আ.) মারা গেছেন। আর হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর আগমনবার্তা আছে এই কুরআনে। এভাবে বলাতে সকলে তওবা তওবা বলে বিদায় হন। গালাগালি করতে করতে চলে যান। এসব কথা শুনে কেউ কেউ চিন্তা ভাবনা করতো এবং এভাবে পরবর্তীতে বেশ কিছু লোক বয়আত গ্রহণ করেন। বাড়িতে একটি ঘরে নামাযের ব্যবস্থা করে ওয়াক্তিয়া ও জুমুআর নামায আদায় শুরু হয়ে যায়।

তারও বেশ পরে ১৯৮৯ এর প্রথম দিকে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর জনাব মোস্তফা আলী সাহেব (মরহুম) মহারাজপুর জামাত প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেন এবং প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট হিসাবে আব্বাকে অনুমোদন দান করেন। তখন থেকে (১৯৮৯ থেকে) মহারাজপুর জামাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জনাব আব্দুল নূর মোল্লা (মরহুম) আমার পিতা। আজীবন ১৯৯৯ এর আগষ্ট পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। নিজের জায়গা থেকে মসজিদের জন্য জমি দান করে গেছেন। তাঁর সে জায়গায় এখন মহারাজপুর জামাতের মসজিদ অবস্থিত।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তার সন্তান-সন্ততি, নাতী-নাতনী প্রায় (৫০ এর মতো) সকলেই জামাতভুক্ত। আমার পিতার রূহের মাগফিরাত কামনা করছি ও দোয়ার জন্য সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট বিনীত অনুরোধ করছি।

জ্ঞানার্জনের জন্য বই পড়া উত্তম

মোহাম্মদ সালাউদ্দীন ঢালী

কুরআন মানুষকে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছে যে,। "হে আমার প্রভু! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও।" (সূরা ত্বাহা, ২০:১১৩) কুরআনের পাশাপাশি বই আমাদের জীবনের সবচাইতে উৎকৃষ্ট সাথী, যা বস্তুগত সাফল্য অর্জন, আত্মার উন্নতি সাধন এবং মানবিক গুণাবলীর একমাত্র বাহন। বই আমাদের উচ্চ সমাজের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। বইয়ের সান্নিধ্য মানুষের মনকে বড় করে তোলে। তাই প্রত্যেক আহমদী, ছোট, বড়, যুবক-যুবতী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরকে অবশ্যই বই পড়া উচিত। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর লেখা যে বইগুলো আছে তা আমাদের মনোযোগ দিয়ে পড়া উচিত। কারণ আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "যাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান দান করা হয়েছে, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী তার বিখ্যাত "বই কেনা" প্রবন্ধে বলেছেন– "বই কিনে কেউ কোন দিন দেউলিয়া হয় না।" আমাদের জামাতের অনেক বই আছে যা আমাদের কেনা এবং পড়া অতীব জরুরী। বই মানুষের কলুষিত আত্মাকে পরিষ্কার করে। কোন ব্যক্তি যখন বই পড়ার আনন্দের মধ্যে ডুবে থাকে অথবা কুরআন পড়ার মধ্যে থাকে তখন তার মন থেকে সমস্ত কু-চিন্তা দূর হয়। সুইফ্‌ট বলেছেন–"বই হচ্ছে মস্তিষ্কের সন্তান।" এই পৃথিবীতে যে ব্যক্তি যত বেশি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান তার পিছনে একটাই কারণ আর তা হল কুরআন ও বই পড়া। ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ বিশ্ব বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে বসে এমন মনোযোগ সহকারে বই পড়তেন যে কখন লাইব্রেরীর দরজা-জানালা বন্ধ করে দিতেন তা তিনি বুঝতেও পারতেন না। একবার পাকিস্তানের জাতীয় কবি ডঃ আল্লামা ইকবাল মনোযোগ সহকারে বই পড়ছিলেন। এদিকে পাঞ্জাবে ভূমিকম্পের ফলে দালান কোঠা সব ভেঙ্গে পড়েছিল, চারিদিক হতে মানুষের কান্নার রোল ভেসে আসতে লাগল অথচ তিনি সামান্য পরিমাণও বুঝতে পারেন নি। বিশ্ব কবি রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখার ফাঁকে ফাঁকে বই পড়ে নিতেন। তিনি বলেছেন– "মানুষ বই দিয়ে অতীত ও ভবিষ্যতের সাঁকো বেধে দিয়েছে।"

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম রুটি বানানোর ফাঁকে ফাঁকে বই পড়ে নিতেন। কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র বই পড়তেন গোয়াল ঘরে বসে। ঠিক তেমনই রুশ লেখক মেক্সিম গোর্কী যখন কোন বন্ধুর বাসায় বেড়াতে যেতেন সময় পেলে বই পড়ে নিতেন। মহানবী (সা.) বলেছেন– "জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক নর-নারীর ওপর ফরয।" তিনি আরও বলেছেন, "তোমরা জ্ঞান অন্বেষণ কর দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত।" আত্মার উন্নতি ঘটানোর নানা পন্থা আছে তবে বইয়ের বিকল্প কিছু নেই। প্রাচীন ভারত বর্ষের সভ্যতা আমাদের অল্প হলেও জানা আছে। তাদের শুধু আত্মার পরিচয় বা সাক্ষাৎ নয় বরং তাদের বাহ্যিক পরিচয়ও আমাদের জানার প্রয়োজন। বইকে তারা গৃহ সজ্জার কাজে ব্যবহার করত। দু-একটি বই পড়ার জন্য রাখা হত। কোন মানুষ যদি মনে করে তার পবিত্র আত্মাকে ধরে রাখবে তার জন্য কুরআন শিক্ষা এবং বই-ই যথেষ্ট। কারণ, "পড়া আমাদের মানসিক যন্ত্রণাগুলোকে দূর করে।"

প্রমথ চৌধুরী তার "বই পড়া" প্রবন্ধে বলেছেন– "মনকে সজাগ ও সরল রাখতে না পারলে জাতির প্রাণ যথার্থ স্ফূর্তি লাভ করে না। তারপর যে জাতি যত বেশী নিরানন্দ সে জাতি তত বেশী নির্জীব।"

সংস্কৃতিতে আছে–"নিদ্রা কলহে দিন যাপনের চাইতে কাব্য চর্চায় কালাতিপাত করা যে প্রশংসনীয়।" একাকিত্বের একমাত্র বাহন হল বই। প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া বাকী সময় যদি ইবাদত ও বই এর মধ্যে ডুবে থাকি তবে আমাদের আত্মার অপমৃত্যু হবে না। হতে পারেন এমন আছেন যার বই কেনার সামর্থ নেই। কিন্তু একবার মার্ক টুয়েনের কথা ভাবি যিনি নিজের অর্থে লাইব্রেরী তৈরী করতে পারেননি তাই বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে বই ধার করে পড়তেন।

কবি ওমর খৈয়াম বইকে অনন্ত যৌবন বলে আখ্যায়িত করেছেন। পল্লী কবি জসীম উদ্দিন বলেছেন, "বই গুণের প্রতীক, বই আনন্দের প্রতীক, সৃষ্টির আদিকাল হতে মানুষ আসছে আর মারা গেছে, খ্যাতিমান, অর্থ, শক্তি কিছুই কেউ রেখে যেতে পারেনি।"

হাদীসে আছে– "পূর্ণিমার রাতের সকল তারকার ওপর চাঁদের যেরূপ মর্যাদা, সাধারণ ইবাদতকারীর ওপর জ্ঞানী ব্যক্তির মর্যাদাও সেরূপ।" অনেকের সামর্থ কম থাকার কারণে বিদেশ ঘুরে জ্ঞানার্জন করতে পারেনা তাছাড়া মানসিক দুঃশ্চিন্তা ও অনেক ঘটে ফলে মনের অপমৃত্য হয় কিন্তু যখন আমরা ঘরে বসে মনের বিকাশ ঘটাতে পারব তখন চাওয়া পাওয়া পূর্ণ হবে। মানবিক গুণাবলী বাড়ানোর পাশাপাশি কোন জাতিকে সভ্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বই একমাত্র সহায়ক।

মুঘল সম্রাট বাবরের পুত্র হুমায়ন বইয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরে গড়ে তুলে ছিলেন বিরাট এক লাইব্রেরী। এমনকি তার কয়েকটি বই উট বয়ে বেড়াতো, প্রায় যুদ্ধে তিনি পরাজিত হয়ে নির্বাসনে যেতেন এবং নির্বাসনের একমাত্র সঙ্গী ছিল বই। বই পড়ে তিনি মনের খোরাক মিটাতেন।

মহানবী (সা.) বলেছেন– "বিদ্বানের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র।" তিনি আরও বলেছেন, "রাতের বেলা এক ঘন্টা জ্ঞান চর্চা করা, রাত জেগে নফল ইবাদত করার চেয়ে উত্তম।"

"খুলে দাও দ্বার, নীলাকাশ করো অবারিত
কৌতুহলি পুষ্পগন্ধ কক্ষে মোর করুক প্রবেশ।"

রবীন্দ্রনাথের কবিতার মত আমরা আমাদের মনের দ্বার খুলে দেই। বইয়ের জ্ঞানে আমাদের জীবন পরিপূর্ণ হোক। পরিশেষে এডিসনের কথা দিয়েই আমার লেখার সমাপ্তি টানতে চাই। তিনি বলেছেন– "যদি সম্ভব হত, আর কিছু নয়, মৃত্যুর পর আমি সঙ্গে করে কিছু বই নিয়ে যেতাম।"

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি
রবিবার, নভেম্বর ২২, ২০১৫

পাকিস্তানের ঝিলামে আহমদী মুসলিমদের ওপর উচ্ছৃঙ্খল জনতার হামলা

আহমদীয়া মুসলিমদের মালিকানাধীন চিপবোর্ড কারখানা এবং আবাসিক এলাকায় হাজারো লোকের জমায়েত।

গত শুক্রবার (২০ নভেম্বর ২০১৫) পাকিস্তানের ঝিলামে একটি চিপবোর্ড কারখানায় হাজারো লোকের উচ্ছৃঙ্খল জনতা আহমদী মুসলিমদের হত্যার চেষ্টা চালায়।

এই সহিংসতা পরে নিকটবর্তী শহর কালা গুজরান পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যেখানে দাঙ্গাবাজদের আরেকটি দল শনিবার আহমদীয়া মসজিদ 'বায়তুল যিকরে' লুটপাট চালায়।

দাঙ্গা শুরু হয় তখন, যখন একজন স্থানীয় লোক আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ওপর কুরআন অবমাননার মিথ্যা আরোপ লাগায়।

উচ্ছৃঙ্খল জনতা দ্রুতই আহমদী মুসলিমদের মালিকানাধীন চিপবোর্ড কারখানায় জমায়েত হয় এবং পাথর ছুঁড়তে শুরু করে, এরপর আহমদীরা ভিতরে বন্দী থাকা অবস্থায় কারখানাটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

পুলিশ আহমদীদের পালাতে সাহায্য করে কিন্তু তার আগেই উচ্ছৃঙ্খল জনতা আহমদী পরিবারগুলোর নিকটবর্তী বাড়িঘরে হামলা চালায়। আহমদীয়া মুসলিম জামাত পাকিস্তানে দশকের পর দশক ধরে মারাত্মক নির্যাতন সহ্য করে আসছে। গত বছর এরকম এক ঘটনায় গুজরানওয়ালাতে একজন বয়স্ক মহিলা এবং দু'জন শিশুকে হত্যা করা হয়। ঝিলামের আহমদীরা পূর্বেও অনেকবার হুমকি পেয়েছে।

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল
“ইসলামে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার।”
পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

ইসলামে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার

শাব্দিক অর্থে জ্ঞানই হলো বিজ্ঞান আর বিজ্ঞান শব্দের অর্থ হলো বিশেষ জানা। এটি তথ্য নির্ভর। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের অর্থ হচ্ছে মানুষের জীবন যাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রকৃষ্টভাবে বিজ্ঞান শক্তি যুক্ত হওয়া। ফলে জীবন যথার্থ সমৃদ্ধ। বর্তমান যামানায় আধুনিক জীবন ও প্রযুক্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রযুক্তিকে বাদ দিয়ে আধুনিক জীবন যাপনের কথা ভাবাই যায় না। সমস্ত বিশ্ব আজ একটি “গ্লোবাল-ভিলেজ”-এ পরিণত হয়েছে।

বস্তুতঃ মানুষ একটি ক্ষুদ্র বিশ্ব বিশেষ। বহির্বিশ্বে যা কিছু আছে– এর সব কিছুই ক্ষুদ্রাকারে মানুষের মধ্যে রয়েছে। প্রযুক্তির বিজ্ঞানের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে পৃথিবী দ্রুত উন্নয়নের দিকে পরিচালিত হচ্ছে। গড়ে উঠেছে সাড়া বিশ্বে পরস্পরিক সহযোগিতা। মানুষের জীবন দানকারী সভ্যতাকে আলোয় নিয়ে এসেছে এই বিজ্ঞান। এর অধিক প্রয়োজনের ফলে আখেরী যামানার এমন অস্থিরতার মধ্যেও জামাতে আহমদীয়া যেভাবে ইসলামের প্রকৃত ও সঠিক মর্মবাণী বিশ্বের সমগ্র মানবসম্প্রদায়ের মধ্যে (যাঁরা মূলতঃ সত্যসন্ধানী) প্রচার করে চলেছে তার তুলনা বিরল। আলহামদুলিল্লাহ্! এটা সম্ভব হয়েছে সাম্প্রতিক কালের তথ্য প্রযুক্তির বিস্ময়কর উন্নতির যুগপত অবদানের জন্য।

প্রকৃতপক্ষে অবতীর্ণ ধর্ম-গ্রন্থের অনুমোদন ছাড়া কেবল মানুষের বিজ্ঞান যুক্তি কোন ধর্মের বা ধর্ম-বিশ্বাসের সত্যমিথ্যা যাচাইয়ের ভিত্তি হতে পারে না। কুরআন পাকের সূরা আন্-নাবার ৩০নং আয়াতে আছে–“এবং আমরা সবকিছুই এক কিতাবে সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছি।” আধুনিক আবিষ্কার টিভি, বেতার যন্ত্র, টেপরেকর্ডার, ভিডিও রেকর্ড, ইন্টারনেট ইত্যাদি এই সত্যকে আমাদের কাছে তুলে ধরেছে যে, কেবল মানুষের কার্যকলাপই নয় বরং তাদের কথা বার্তাও সংরক্ষণ করে রাখার পাশাপাশি হুবহু পুনরাবৃত্তিও করা সম্ভব হচ্ছে।

সূরা আল্ ইন্‌ফিতারের ৫নং আয়াতে বলা হয়েছে–“এবং যখন কবরসমূহকে উৎপাটিত করা হইবে”। শেষ যুগে কবরসমূহে উৎপাটিত করা হয়েছে মিশরের অতীত বাদশাহ্‌গণের কবরের ক্ষেত্রে। শেষ যুগ বিলুপ্ত ও বিস্তৃত শহর এবং স্মৃতিসৌধগুলি খনন করে মাটির নীচ থেকে বের করা হবে।” এটা সম্ভব হয়েছে প্রযুক্তির কল্যাণে। অসংখ্য সুদূর প্রসারী পরিবর্তন এবং নব নব আবিষ্কার মানুষকে এমন ভাবে তাক লাগিয়ে দিবে যে মানুষ আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলে উঠবে যে, পৃথিবীর হলো কি? নবী করীম (সা.)কে আয়াতটির অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এই উত্তর দিয়েছিলেন যে–গোপন কৃতকর্মও তখন প্রকাশিত হয়ে পড়বে” (তিরমিযী)। সংবাদ পত্রের মাধ্যমের যত বাহুল্য হবে যে, কোন কাজ গোপন রাখা সম্ভব হবে না। বর্তমানে প্রযুক্তির কল্যাণে এটাই হচ্ছে।

সূরা আল্ যিল্‌যালের ৫নং আয়াতে বলা হয়েছে–নব নব আবিষ্কারে জ্ঞান বিজ্ঞানের নতুন নতুন উদ্ভাবনীতে সবকিছুর আকৃতি-প্রকৃতিই বদলাইয়া যাইবে। এবং পৃথিবী ইহার বোঝা বাহির করিয়া দিবে। পৃথিবীর বুক চিরে উন্মুক্ত করা হইবে এবং পৃথিবী আপন বক্ষ হইতে খনিজ সামগ্রী ধনদৌলত বাহির করিয়া দিবে কেননা প্রতিপালক প্রভু ইহাকে করতে আদেশ দিয়ে রেখেছেন।’ মানুষ তার জীবন যাপনের সকল ক্ষেত্রে প্রযুক্তির সার্বিক প্রয়োগ করে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান বিদ্যুৎ আবিষ্কার। মানব সভ্যতার বিকাশে এর অসামান্য অবদান সত্যিই অনস্বীকার্য। আনবিক শক্তি, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন ইত্যাদি প্রযুক্তি বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার। অথচ এগুলোর সঠিক ব্যবহারই হলো আশির্বাদ স্বরূপ! কিন্তু বর্তমান যামানায় এগুলোর যে অপব্যবহার চলছে আগামী প্রজন্ম যে কি হালে থাকবে তা ভাববার বিষয়! বর্তমান প্রজন্মের ওপরে এগুলোর কু ব্যবহারের ফলে মানব সভ্যতার নৈতিক অধঃপতনের যে অবস্থা কু-প্রভাব ফেলেছে প্রত্যেক দিনের পত্র-পত্রিকা খুললেই অন্তর-দেহ শিহ্‌রে উঠে? আল্লাহ্ তা’লা আমাদেরকে ও ভবিষ্যত উত্তরসূরীদেরকে এগুলোর কুপ্রভাব থেকে হেফাযত করুন (আমীন)। ইসলামে তো খোদা প্রদত্ত নিয়ম-নীতিগুলোকে সঠিক প্রয়োগের জন্য নির্দেশ দিয়েছে। তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলাইতো তাক্‌ওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

এ যুগে মিডিয়া স্যাটেলাইটের এত ব্যাপকতাও যা আখেরী যামানারই লক্ষণ! বর্তমান সময়ে অসংখ্য মানবের আধুনিক জীবন যাপনের জন্য এগুলোর প্রচারণা ভাল ও মন্দ দুটি দিকই প্রভাব ফেলেছে। মানুষের বিবেক যা গ্রহণ করছে তারই ফল ভোগ করছে। এহেন পরিস্থিতিতে জামাতে আহমদীয়ার এমটিএ (মুসলিম টিভি আহমদীয়া) স্যাটেলাইটটি তার যোগ্য আসন করে নিয়েছে। এটা মহান প্রভুরই ইচ্ছা, এই এমটিএ স্যাটেলাইট সমস্ত বিশ্বে ইসলামের প্রকৃত খাঁটি রূপ বাণী প্রচার করে চলেছে। বিশ্বের সত্যানুসন্ধানীগণেরাই এ স্যাটেলাইট থেকে বহু ফায়দা হাসিল করে দুই জাহানের জন্য উপকৃত হচ্ছে। ভাবা যায় খোদার অশেষ করুণাধারা কিভাবে সত্য সন্ধানীদের ওপর বর্ষণ হচ্ছে! আলহামদুলিল্লাহ্! এমটিএ-এর ‘সত্যের সন্ধানে’ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দাজ্জাল বিষয়ে ফুটেজটি ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর আসার লক্ষণ সম্পর্কে কিভাবে সম্ভব স্পষ্ট যুক্তি পেশ করে ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমন কিভাবে নস্যাৎ করার যুক্তি পেশ করছে তা খুবই সময়পোযোগী পদক্ষেপ। এ চেষ্টা কেবলমাত্র ইসলামে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারেরই জন্য সম্ভব হচ্ছে। গ্রহণ করা মানুষের বিবেকাধীন। সকল ক্ষেত্রেই যদি মানুষ ইসলামী নিয়ম নীতি মেনে চলতো তাহলে যাবতীয় বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হতো।

আনোয়ারা বেগম, রংপুর

আধুনিক বিশ্ব প্রযুক্তি নির্ভর

প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার করতে ইসলাম বাধা দান করে না বরং উৎসাহ প্রদান করে থাকে। পবিত্র কুরআনের এক অষ্টমাংশ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্বের কথায় ভরপুর। উট আজ বেকার। রেলগাড়ী, উড়োজাহাজ, রকেট ইত্যাদি আজ মানুষের বাহন। আরো উন্নতির বাহন এসবের স্থান দখল করবে তা পবিত্র কুরআনে বিদৃত আছে।

বর্তমান সভ্যতার যুগ এমনই আকাশ ছুঁয়া যে, সব কিছুই যেন মানুষের হাতের নাগালে এসে গেছে। সব কিছুই সহজলভ্য হয়ে গেছে। প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ গ্রহ হতে গ্রহান্তরে ছুটছে। নৃতত্ব, ভূতত্ব, মনোজগৎ সব ক্ষেত্রেই আজ প্রযুক্তি নির্ভর সভ্যতা বিকশিত। "এবং জীবন্ত পুতে ফেলা কন্যা (সন্তানের) সম্পর্কে যখন জিজ্ঞাসা করা হবে" (সূরা আত্ তাকভীর ঃ ৯)। তার পার্থিব অংশ আজ আমরা পূর্ণ হতে দেখছি। প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনেক হত্যা রহস্য উদঘাটন করা হচ্ছে। মোবাইল, ইন্টারনেট, ফেইসবুক ইত্যাদির মাধ্যমে মুহূর্তের সময়ে পৃথিবীর দূরতম সংবাদ এসে যাচ্ছে কাছে। সংবাদ আদান প্রদান হয়েছে সহজতর। একই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে অশ্লীলতার প্রসার। শুধু তাই নয় অপসংস্কৃতির বিস্তারের থাবা থেকে সরলমনা শিশুরাও রক্ষা পাচ্ছে না। আর তা এত ভয়ঙ্কর যে, যেন, গ্রাস করে ফেলেছে পৃথিবীকে। এ মহামারী থেকে আত্মরক্ষার উপায় কি আছে, না আদৌ নেই? আমরা বিশ্বাস করি এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এর প্রতিকার অবশ্যই আছে।

আমাদের পরিধি পরিবারের অভিভাবকরা এর গুরুত্ব উপলব্ধি করি এবং এখন থেকে সচেতন হই এবং যুগ খলীফার দিক নির্দেশনার আলোকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করি তবে অবশ্যই ইনশাআল্লাহ্ আমরা প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার শিখতে পারবো এবং এর অপব্যবহার থেকে নিজেদের ও নিজেদের পরিবার বর্গকেও মুক্ত রাখতে পারবো। প্রযুক্তি অভিশাপ নয় বরং আশির্বাদ। প্রযুক্তি ব্যবহার করেই কৃষিতে এসেছে বিপ্লব। আধুনিক বিশ্ব প্রযুক্তি নির্ভর।

এম,টি,এ-এর মাধ্যমে আজ যুগ খলীফা প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পৌঁছে সত্য ও সুন্দরের পথনির্দেশনা পার্থিব ও আত্মিক ব্যাধি সমূহ হতে নিরাময়ের ব্যবস্থা পত্র প্রদান করছেন। ইসলামের স্বপক্ষে প্রযুক্তিকে সঠিক ব্যবহারের এ এক মহান বিপ্লব ও অগ্রযাত্রা। হুযূর (আই.)-এর খুতবা, সত্যের সন্ধানে, রাহে হুদা, ইয়াসসারনাল কুরআন, পবিত্র কুরআনের দরস সহ অসংখ্য অনুষ্ঠান অহোরাত্র প্রচারিত হয়ে চলেছে। এসব অনুষ্ঠান নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা এবং ঈমান ও আমলে সুদৃঢ় হওয়ার জন্য অনন্য ব্যবস্থাপত্র। শয়তানের সাধ্য কি এসব আধ্যাত্মিক অস্ত্রের সম্মুখে টিকে থাকে।

আমাদের সৌভাগ্য আমরা যুগ খলীফার অধীন। যুগ খলীফা (আই.) সমস্যার প্রারম্ভেই আমাদের সতর্ক করেন। এমটিএ আমাদের জন্য রক্ষা কবচ। আমরা নিজেরা আমাদের পরিবার বর্গ এবং আমাদের শিশুরা এবং পাড়া প্রতিবেশীকে যত বেশী এম,টি,এ-এর সাথে সম্পৃক্ত করতে পারবো তত দ্রুতই আমরা প্রযুক্তির অপব্যবহার থেকে মুক্ত হব। একটি কথা অতীব গুরুত্বপূর্ণ আর তা হল প্রতিটি পরিবারে নামায কায়েম করা। নামায অশ্লীলতা, মন্দকর্ম ও বিদ্রোহ হতে রক্ষা করে। আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার করে উন্নত জীবন যাপনের সৌভাগ্য দান করুন।

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, বড়চর

আকাশের আবরণ যখন খুলে ফেলা হবে

বর্তমান যুগে যে পৃথিবীতে মিডিয়ার ব্যাপক বিস্তার ঘটবে তাও কিন্তু মহান আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন এ যুগে পত্র-পত্রিকা ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হবে এবং বিজ্ঞান অনেক উন্নতি করবে। যেমন বলা হয়েছে **"ওয়া ইযাস সুহুফু নুশেরাত, ওয়া ইযাস সামাউ কুশেতাত"** অর্থাৎ 'এবং পুস্তক-পুস্তিকা যখন ব্যাপকভাবে প্রকাশ করা হবে এবং ছড়িয়ে দেয়া হবে। এবং আকাশের আবরণ যখন খুলে ফেলা হবে' (সূরা আত তাকভির: ১১-১২)। এ আয়াতের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হয় যে, শেষ যুগে বিশ্বব্যাপী সংবাদপত্র, সাময়িকী ও পুস্তক-পুস্তিকার প্রকাশনা ও প্রচারের বিরাট আয়োজন, লাইব্রেরী-পাঠাগার প্রতিষ্ঠা এবং সর্বত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার ঘটবে। শেষ যুগে মহাকাশ বিজ্ঞান যে ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করবে আলোচ্য আয়াত এদিকেই ইঙ্গিত করছে। আমরা জানি, বিজ্ঞানের এ শাখা গত এক শতাব্দিতে যে উন্নতি লাভ করেছে তা মানুষকে হতবাক করে দেয়। বিজ্ঞান মানুষের অতন্ত্র সাধনার ফসল। সভ্যতার ধর্ম যেমন এগিয়ে চলা। বিজ্ঞানে ধর্ম ঠিক তাই। তাই আজ সভ্যতার সংগে বিজ্ঞানের সম্বন্ধ এমন অঙ্গাঙ্গী ও গাঁটছড়া বন্ধন। বিজ্ঞানের সাহায্যেই দূরের নক্ষত্রলোকের খবর পেয়েছে মানুষ, গ্রহলোকের সম্বন্ধে আহরণ করেছে নতুন তথ্য। যেমন টেলেক্স, ফ্যাক্স, স্যাটেলাইট, নেটওয়ার্ক (টিভি)।

সমগ্র বিশ্ব মুসলিমের হাতে আজ এমন একটি মিডিয়া নেই যার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে ইসলামী দিক নির্দেশনা দেয়া যাবে। আজকে কেবল মাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'তেরই একক বৈশিষ্ট যে, তাদের কাছে এমন মিডিয়া রয়েছে যার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে একমূহুর্তে ইসলামের বাণী পৌঁছানো সম্ভব। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মিডিয়ার মাধ্যমে দিন রাত ২৪ ঘন্টা শুধু প্রকৃত ইসলামের বাণীই প্রচার করা হচ্ছে। যুগ খলীফা শুক্রবারে যে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন তা সরাসরি সমগ্র বিশ্বে একযোগে দেখানো হয় এবং সেই খুতবা পরের শুক্রবারে সমগ্র বিশ্বে হাজারো মসজিদের ইমামুস সালাতগণ নিজ নিজ ভাষায় মুসল্লিদের শুনিয়ে থাকেন। যার ফলে সমগ্র বিশ্বের লোকেরা আধ্যাত্মিক খাদ্য উপভোগ করেন। এই প্রযুক্তিকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের লোকেরা খোদা তাআলার এক বিশেষ নেয়ামত হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

আজকে সমগ্র বিশ্বে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া এমটিএ-এর মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামের বার্তা সবার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। যারা ইসলাম সম্পর্কে মন্দ ধারণা রাখে তাদেরকে এই মিডিয়ার মাধ্যমে আলোর সন্ধান দেয়া হচ্ছে। প্রযুক্তি খোদা তা'লার যে কত বড় নেয়ামত এটা কেবল তারাই গ্রহণ করে যাদেরকে খোদা স্বয়ং জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে থাকেন।

এই প্রযুক্তির সুবাদেই আমাদের প্রিয় খলীফা লন্ডন থেকে সরাসরি আমাদের সামনে বক্তব্য রাখছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

ফারহানা মাহমুদ তন্বী, তেজগাঁও

সং বা দ

নাখালপাড়ায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা

গত ২৭ নভেম্বর রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ ঢাকার নাখালপাড়া হালকায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব সিহাম জোহেব বাপী, উর্দূ নযম পেশ করেন জনাব নাসির আহমদ। বক্তৃতাপর্বে 'বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)' এ বিষয়ে বক্তৃতা দেন মওলানা শাহ মোহাম্মাদ নুরুল আমীন, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পরিচিতি পাঠ করেন মৌলভী নাসের আহমদ আনসারী। অনুষ্ঠান শেষে এক জন বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামাতে প্রবেশ করেন।

দোয়া পরিচালনা করেন জনাব শামছ-উদ্-দ্বীন ভূইয়া, প্রেসিডেন্ট, নাখালপাড়া হালকা। এতে মেহমানসহ আহমদীগণ উপস্থিত ছিলেন।

আজিজুল হক

পটুয়াখালীতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা

গত ১৩-১১-২০১৫ তারিখ বাদ জুমুআ সীরাতুন নবী (সা.) জলসা পটুয়াখালী নূর-মসজিদে উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতির আসন গ্রহণ করেন জনাব এ, এম দেলোয়ার হোসেন, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, পটুয়াখালী। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব কাইয়ুম হাওলাদার। এরপর নযম পাঠ করেন মনিবুর রহমান। বক্তৃতা পর্বেঃ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অতুলনীয় মর্যাদা এবং নামায প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মৌ. তৌহিদুল ইসলাম। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র জীবন এবং উত্তম আদর্শ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলনা নওশাদ আহমদ। সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ এবং দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এতে ২১ জন আহমদী এবং ৩ জন মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

খাকদানে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা

গত ৩০-১০-২০১৫ তারিখ খাকদান জামাতে বাদ জুমুআ সীরাতুন নবী (সা.) জলসা পালন করা হয়। এতে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোতাহার হোসেন মৃধা, প্রেসিডেন্ট, আ.মু.জা. খাকদান। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব ডা. আবু বক্কর সিদ্দিক। নযম পাঠ করেন জনাব সুলতান আহমদ আকন্দ। বক্তৃতা পর্বে ঃ 'মহানবী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাল্য জীবন' নিয়ে আলোচনা করেন ডা. আবু বক্কর সিদ্দিক। 'মদীনা সনদ এবং এই বিষয়ে আমাদের করণীয় কি' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মৌ. আব্দুর রহমান। 'হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনাদর্শ' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা নওশাদ আহমদ। সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩১ জন আহমদী এবং ১ জন মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

নওশাদ আহমদ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা

গত ১০/১০/২০১৫ রোজ শনিবার বাদ মাগরীব বায়তুল ওয়াহেদ মসজিদে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ মঞ্জুর হুসেন, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব কাওসার আহমদ, নযম পাঠ করেন নুরুউদ্দিন উদ্দিন আহমদ। দায়ীইলাল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এ বিষয়ের ওপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন মৌ. এস এম আবু তাহের। খাতামান নবীঈন (সা.) এর চিরস্থায়ী কল্যাণ এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন মওলানা জহিরউদ্দিন আহমদ। বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব আতাই রাব্বী। মহানবী (সা.) এর পরমত সহিষ্ণুতা বিষয়ে জ্ঞানগর্ব বক্তব্য রাখেন সভাপতি। সবশেষে উপস্থিত জেরে তবলীগদের নিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন সভাপতি। অতঃপর দোয়ার মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে ১২০ জন উপস্থিত ছিলেন ।

এনাম খান

তেরগাতী জামাতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা

গত ১৫/১১/২০১৫ রোজ রবিবার বাদ মাগরীব জনাব সৈয়দ আনোয়ার আলী, প্রেসিডেন্ট-এর সভাপতিত্বে সীরাতুন নবী (সা.) জলসার কাজ আরম্ভ হয়। উক্ত সীরাতুন নবী (সা.) জলসায় কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব আব্দুর রব খন্দকার। নযম পরিবেশন করেন মাসরূর আহমদ উৎস। বক্তৃতাপর্বে 'হযরত রসূল করীম (সা.) মানবজাতির জন্য হেদায়াত' এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন, জনাব নজরুল ইসলাম। 'মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা অনুযায়ী আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক' এ সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেন মৌ. ওয়ালীউর রহমান। 'সীরাতে মুস্তাকীম' এ সম্পর্কে বক্তৃতা রাখেন জেরে তবলীগ মওলানা বজলুর রহমান। এরপর একটি বাংলা নযম পেশ করেন জনাব দুর্জয় আহমদ তুষার।

পরিশেষে ইসলামের অতুলনীয় সৌন্দর্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন মওলানা রাসেল সরকার। সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ করা হয়। এতে ২০ জন জেরে তবলীগসহ ১০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

জেলা মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র ২১তম বার্ষিক ইজতেমা ২০১৫ অনুষ্ঠিত

গত ১২ ও ১৩ নভেম্বর বৃহস্পতি ও শুক্রবার জেলা মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে ২১তম জেলা ইজতেমা-২০১৫ অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্‌। ১২ নভেম্বর রোজ বৃহস্পতিবার বাদ মাগরীব মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ইজতেমার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোশাররফ হোসেন। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব জহির আহমদ মিয়াজী। আহাদ পাঠ, দোয়া পরিচারনা এবং উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন সভাপতি। নযম পাঠ করেন এনামুল হক ইন্টু। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন জনাব মকবুল আহমদ। আনসারদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ। জামাতের উন্নয়নে আনসারুল্লাহ্‌ সংগঠনের মূল ধারা এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর হুসেন। এরপর বিভিন্ন প্রতিযোগিতা নেয়া হয়।

বাদ জুমুআ সমাপ্তি এবং পুরস্কার বিতরণী অধিবেশন শুরু হয়। সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন রিজিওনাল নাযেম জনাব মোশাররফ হোসেন। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পেশ করেন যথাক্রমে এস, এম ইব্রাহীম ও তৌফিক আহমদ। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন সভাপতি। বিগত দিনগুলোর কর্মতৎপরতা এবং আগামী দিনগুলোর কর্মসূচীর ওপর বক্তব্য রাখেন জেলা নাযেম মোহাম্মদ আল আমীন।

অতঃপর ইজতেমার সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন সভাপতি। পুরস্কার বিতরণ, আহাদ পাঠ এবং দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত বার্ষিক ইজতেমায় ১৪টি মজলিস হতে জয়ীম, জয়ীমে আলা, প্রতিনিধি আনসার সমেত মোট ৯৫ জন অংশগ্রহণ করেন, আলহামদুলিল্লাহ্‌।

মোহাম্মদ আল আমীন

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ফতুল্লায় ওয়াকারে আমল পালন

গত ০৬/১১/২০১৫ তারিখ শুক্রবার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ফতুল্লা এর উদ্যোগে বিশেষ ওয়াকারে আমল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মৌলভী এনামুল হক রনি দোয়া পরিচালনা করেন এবং স্থানীয় কায়েদ উদ্বোধন করেন। অত্যন্ত উৎসাহের সাথে দীর্ঘ দু'ঘন্টা ধরে অত্র মজলিসের খোদ্দাম ও আতফালগণ মসজিদের মাঠ, রাস্তা এবং মসজিদের আশপাশের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেন।

এতে জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব ও জয়ীমে আলা উপস্থিত হয়ে উৎসাহ প্রদান করেন। সর্বমোট ২৪ জন খোদ্দাম-আতফাল এতে অংশ নেন।

ডা. কামরুল হাসান সরকার

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া চট্টগ্রামের উদ্যোগে ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত

গত ১৩ই নভেম্বর, ২০১৫ রোজ শুক্রবার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া চট্টগ্রাম-এর উদ্যোগে Blood Grouping Campaign (ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্পেইন) আয়োজন করা হয়। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া চট্টগ্রাম-এর কায়েদ সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে এই ক্যাম্পেইন উদ্বোধন হয়। উক্ত ক্যাম্পেইনে ৮৩ জন খোদ্দাম, আতফাল ও আনসার নিজেদের ব্লাড গ্রুপিং করেন। উল্লেখ্য, এ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করেন জনাব ড. এজাজুর রহমান শুভ এবং তাকে স্থানীয় খাদেমগণ সহায়তা করেন।

কায়েদ, চট্টগ্রাম মজলিস

কৃতি ছাত্র

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, মহান আল্লাহ্‌ তা'লার অশেষ ফযলে মসীহ্‌ উল আলম খান শোভন জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পূর্ণবাসন প্রতিষ্ঠান (NITOR) শেরে বাংলা নগর ঢাকায় বি, এম, সি ইন-ফিজিও থেরাপী কোর্সে ভর্তি পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অর্জন করে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্‌। সে একজন ওয়াকফে নও মোজাহিদ। উক্ত কোর্সে সফলতার সাথে দেশ ও মানবতার সেবা করার সুযোগ লাভের জন্য জামাতের সকল ভাই বোনদের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

দোয়াপ্রার্থী
মৌলবী শাহ আলম খান ও
মিসেস মরিয়ম সিদ্দীকা

শোক সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত কানাডার সদস্যা রেজিয়া বেগম গত ১৭ই নভেম্বর ২০১৫ তারিখ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মরহুমা ৫৭ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত আহমদী। উনার পিতা মরহুম ফরিদ আহমদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং স্বামী নিজামুল হক ভাদুঘর। মৃত্যুকালে মরহুমা এক ছেলে, এক মেয়ে, এক নাতি সহ অনেক গুণগ্রাহী রেখে যান। তিনি কানাডার লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র কর্মী ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ক্যান্সার রোগে ভুগছিলেন। তিনি মোখলেছ ও ধার্মিক লাজনা ছিলেন। তিনি নিয়মিত সত্যের সন্ধানে প্রশ্ন করতেন এবং এমটিএ দেখতেন। খলীফায়ে ওয়াক্ত ও নেযামের পূর্ণ আনুগত্য ও ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন। তিনি মেহমান নেওয়াজি ও খেদমতগার ছিলেন। উনার অকাল প্রয়াণে পরিবার শোকাহত। আল্লাহ্‌ এই মহিয়ষী লাজনার নেক আমল কবুল করে বেহেশ্‌তবাসী করুন, জামাতের সকলের নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি।

মরহুমার ছোট ভাই
শামীম আহমদ
দক্ষিণ আহমদী পাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত ৪ ডিসেম্বর, ২০১৫ জুমুআর খুতবার সারমর্ম

গত শুক্রবার লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় হুযূর আনোয়ার (আই.) হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর ভাষায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি তাঁর নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীদের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম এবং তাঁর সাহচর্য লাভের ব্যাকুল বাসনা সম্পর্কিত বিভিন্ন ঈমান উদ্দীপক ঘটনা বর্ণনা করেন।

হুযূর বলেন, মহানবীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে শেষ যুগে আগত প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য আর আল্লাহ্ স্বীয় ওয়াদা পালনে বদ্ধপরিকর। তিনি আখারীনদের মাঝে নিজ মসীহ্‌কে প্রেরণ করেছেন। তাঁর হাতে যারা বয়আত করেছেন তাদেরকে ঈমান ও বিশ্বাসে দৃঢ়তা দিয়েছেন। তাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মসীহ্ মাওউদ (আ.) খোদা-প্রেরিত আর তিনি যা বলেন খোদার নির্দেশেই বলেন। খোদা তা'লা তাঁর প্রতি ওহী ও ইলহাম করেন। এই দৃঢ় বিশ্বাসের কারণেই প্রতিদিন সকালে সাহাবীগণ মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাড়ীর সম্মুখে জড়ো হয়ে জানতে চাইতেন, আজ রাতে কি ইলহাম হয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি তখন খুবই ছোট ছিলাম, যখনই আমাদের ঘর থেকে কেউ বের হতো তারা তাকেই জিজ্ঞেস করতেন গতরাতে নতুন কি ইলহাম হয়েছে। তিনি বলেন, সাহাবীদের আগ্রহের কারণে আমি অনেক সময় হুযূর নামাযের জন্য মসজিদে চলে গেলে চুপিসারে গিয়ে তাঁর নোটবুক ঘেঁটে দেখতাম যে, তাতে নতুন কোন ইলহামের উল্লেখ আছে কি-না? সাহাবীদের এরূপ আগ্রহের মূল কারণ ছিল নিজেদের ঈমানকে আরো মজবুত করা আর যুগ মসীহ্‌র সাথে উত্তরোত্তর সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।

হুযূর বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি যেভাবে নির্জনে ইলহাম হতো সেভাবে অনেক সময় তাঁর সাহাবীদের উপস্থিতিতেও ইলহাম হতো আর এরফলে তাঁর অনুসারী ও মান্যকারীদের বিশ্বাস আরো মজবুত হতো। এখানে হুযূর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে মির্যা ইমাম দ্বীনের দেওয়াল নির্মাণ সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিষয়ে খোদা কি ইলহাম করেছেন, সে সময় কে সেখানে উপস্থিত ছিলেন আর বাহ্যতঃ মোকদ্দমা তাঁর অনুকূলে না থাকা সত্ত্বেও অবশেষে খোদার প্রতিশ্রুতি অনুসারে তিনি কীভাবে এতে অভাবনীয়ভাবে জয়লাভ করেন তা সবিস্তারে বর্ণনা করেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীর বাক্যাবলী হুযূর পাঠ করেন এবং বলেন, মামলার রায় ঘোষণার অনেক আগেই মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর শুভ ফলাফল সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করেন এবং আল্ হাকাম পত্রিকায় তা প্রকাশ করেন। খোদার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাস্তবেও এমনটিই ঘটেছে আর তা তাঁর অনুসারীদের ঈমানকে আরো সুদৃঢ় করেছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বৈঠক বা মজলিসের কথা স্মরণ করে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, সে সময়ের কথা এখনো আমার কানে গুঞ্জরিত হয়। আমি ছোট বয়স থেকেই তাঁর বৈঠকে বসতাম, তাঁর রীতি ছিল, দিনের বেলা তিনি যা রচনা করতেন সন্ধ্যায় তা সাহাবীদের শোনাতেন আর এভাবে বই প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই আমরা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রচনাবলীর জ্ঞানলাভ করে ধন্য হতাম। হুযূর বলেন, যারা দুর্বল ঈমানের মানুষ তারা অনেক সময় প্রশ্ন করে বসে এই নির্দেশ কেন দেয়া হল? কিন্তু যারা খোদার মনোনীতকে চিনতে সক্ষম হয় এ ধরনের নির্বুদ্ধিতা হতে আল্লাহ্ তাদের রক্ষা করেন।

এ প্রসঙ্গে মুন্সী অড়োঢ়া সাহেব (রা.) যিনি মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিবেদিত প্রাণ সাহাবী ছিলেন তার একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, সমসাময়ীক লোকজন তাকে বলতো, আপনি একবার সানাউল্লাহ্ অমৃতসরীর বক্তৃতা শুনে দেখুন তাহলে বুঝতে পারবেন যে, মির্যা সাহেবের দাবী কতটা যুক্তিযুক্ত! মৌলভী সাহেবের বক্তৃতা শোনার পর তার মন্তব্য ছিল, আমি মির্যা সাহেবের যে চেহারা দেখেছি তা কোন মিথ্যাবাদীর হতে পারে না। সানাউল্লাহ্ সাহেব যেসব আপত্তি করেছে তা খন্ডন হয়তো আমি করতে পারবো না কিন্তু তাঁর চেহারা কোন মিথ্যবাদীর হতে পারে না তাই দুই বছরও যদি মৌলভী সাহেব আমাকে বক্তৃতা শোনায় তাতেও আমার কিছুই যায় আসে না কারণ আমি আমি তাকে পর্যবেক্ষণাত্বক দৃষ্টিকোন থেকে যাচাই করে মেনেছি। এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি মুন্সী অড়োঢ়া সাহেবের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, প্রেম ও আকর্ষণের কতিপয় ঘটনা হুযূর বর্ণনা করেন হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভাষায়। তিনি মাসে একবার হলেও কাদিয়ান আসতেন, কিছুটা পথ পায়ে হেঁটে আসতেন যাতে অর্থ সাশ্রয় করে তা মসীহ্‌র পবিত্র চরণে নযরানা হিসেবে দিতে পারেন। তার নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, সততার প্রভাব আর খোদা প্রেমের কারণে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাও তাকে কাদিয়ান যাওয়ার জন্য নির্ধারিত দিনে ছুটি দিয়ে দিতেন।

মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের পর তিনি কাদিয়ান এসে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-কে ঘর থেকে ডেকে আনেন এবং তার হাতে ৩/৪টি স্বর্ণমূদ্রা তুলে দিয়ে অঝোরে কাঁদতে থাকেন আর বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে তুলে দেওয়ার বাসনা ছিল কিন্তু সাধ থাকলেও তখন সামর্থ ছিল না এখন আল্লাহ্ সামর্থ দিয়েছেন কিন্তু তিনি আর নেই। কত গভীর ছিল তারা এই ভালোবাসা। হুযূর বলেন, যুগের চাহিদা ও দাবী অনুসারে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এসেছেন। তাঁর প্রতি এরূপ আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, ভালোবাসা ও গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন ছাড়া মুক্তির আশা দূরাশা।

এরপর হুযূর মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি সাহাবীদের অনুরাগ ও ভালোবাসার আরো কিছু ঘটনা বর্ণনা করেন এবং সবাইকে এরূপ ঐকান্তিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার চেতনায় সমৃদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) শিকার করে এনে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর খিদমতে তা পেশ করতেন কারণ তিনি শুনেছিলেন যারা মেধা বা মস্তিষ্কের কাজ বেশি করেন তাদের জন্য এই শিকারের মাংস উপাদেয়। মসীহ্ মাওউদ (আ.) যেহেতু সর্বদা পড়াশুনা ও লেখালেখির কাজে ব্যস্ত থাকতেন তাই তাঁর স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে তিনি ভালোবাসার এই উপহার পেশ করতেন।

খুতবার শেষ দিকে হুযূর বিশ্বের চলমান অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং বিশ্ব যে এক ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের কিনারায় দন্ডায়মান সে সম্পর্কে অবহিত করেন। পরাশক্তিদের ন্যায়-বিচারের অভাব আর স্বার্থপরতার কারণেই এই বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হচ্ছে। হুযূর এই ধ্বংসযজ্ঞ হতে বিশ্বকে রক্ষার জন্য জামাতের সদস্যদের বেশি বেশি দোয়ার অনুরোধ জানান।

মরিশাসে আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠার ১০০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান

আহমদীয়া মুসলিম জামাত যুক্তরাজ্যের আফ্রিকান বিভাগ অর্থাৎ আফ্রিকান মুসলিম এসোসিয়েসন যুক্তরাজ্য শাখার উদ্যোগে যুক্তরাজ্য বসবাসরত সকল আফ্রিকান আহমদীরা একত্রিত হন।

৩১শে অক্টোবর ২০১৫, আহমদীয়া মুসলিম জামাত যুক্তরাজ্যের আফ্রিকান বিভাগ, এবং আফ্রিকায় জামাত প্রতিষ্ঠার ১০০ বছরপুর্তি উপলক্ষ্যে লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ কমপ্লেক্সে সমবেত হয়। শত বছর পূর্বে ১৯১৫ সালে প্রথমবার জামাতের মিশনারী আগমন করে আফ্রিকায় জামাত প্রতিষ্ঠা করেন। বিগত একশত বছরে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আফ্রিকায় শিক্ষা ও স্বাস্থ খাতে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও অসংখ্য স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল নির্মান সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আফ্রিকার অনেক দেশে সম্পূর্ণ বিনা স্বার্থে অভূতপূর্ব কাজ করে যাচ্ছে। যার মধ্যে হাজারের অধিক মসজিদ মিশন হাউস ও আফ্রিকান ভাষায় পবিত্র কুরানের অনুবাদ বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

উপস্থিত আফ্রিকা কমিউনিটির সকলে সম্মিলিত ভাবে এই সফলতা উদযাপন করেন এবং অঙ্গীকার করেন ভবিষ্যতেও সাফল্যের এই ধারা অব্যাহত থাকবে। আফ্রিকা যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি জনাব টমি কোলন সাহেব আগত অতিথিদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন। জনাব হুমায়ন জাহাঙ্গীর জামাতে আহমদীয়ার ইতিহাস পড়ে শুনান এবং জনাব আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, বিশেষ এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামাত এর সভাপতির পাঠানো বার্তা পড়ে শোনান।

বিকালের সমাপ্তি অধিবেশনে যুক্তরাজ্য জামাতের সভাপতি জনাব রফিক আহমাদ হায়াত কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় তুলে ধরেন। তিনি বলেন আফ্রিকা যুক্তরাজ্য শাখার তত্ত্বাবধানে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বেশ কিছু ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব কাজ করে যাচ্ছে। সভাপতি সাহেবের দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। সব শেষে আগত অতিথিদের মাঝে সুসাদু খাবার পরিবেশন করা হয়।

ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাকোয় বাৎসরিক জলসা উদযাপন

আল্লাহর অশেষ রহমত ও কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত ত্রিনিদাদ ও টোবাগো জামাত তাদের প্রধান কার্যালয়ে গত ২৩, ২৪ ও ২৫ অক্টোবর ৩ দিন ব্যাপী বাৎসরিক জলসা উদযাপন করে। শুক্রবার জুম্মার নামাজ আদায়ের পর ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর জাতীয় পতাকা ও জামাতে আহমদীয়ার পতাকা উত্তোলন করা হয়। অ-আহমদী মুসলমান, হিন্দু, খ্রিষ্টান অতিথি সহ প্রায় ৬০০ জন এই মহতী জলসায় অংশগ্রহণ করেন। ২টি প্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রিকা জলসার ছবি সহ বিশেষ কলাম প্রকাশ করে।

আমন্ত্রিত অতিথিদের মাঝে ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর ব্রিটিশ হাই কমিশনার মিস্টার টিম, যুক্তরাষ্টের রাজনৈতিক প্রধান, শ্রম ও ক্ষুদ্র শিল্প মন্ত্রী মাননীয় ভূমি কৃষি ও মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, ও স্থানীয় সংসদ সদস্য বিশেষ অতিথি হিসাবে এই জলসায় উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথিদেরকে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদিত 'ইসলামী নীতি দর্শন' বই উপহার হিসাবে প্রদান করা হয়। কেরিবিয়ান দেশ গুলো থেকে ৫ জন মিশনারী এই মহতী জলসায় উপস্থিত হন ও জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন। তারা হলেন গায়ানার মিশনারী ইনচার্জ মওলানা আহসান উল্লাহ মানগাত ও মওলানা মাকসূর এ মনসুর, সুরিনামের মিশনারী ইনচার্জ মওলানা লেইক আহমাদ মুশতাক, ফ্রেন্চ গুইআনার মিশনারী ইনচার্জ মওলানা সিদ্দিক আহমাদ মুনাওয়ার এবং জ্যামাইকার মিশনারী ইনচার্জ মওলানা উমায়ের খান।

২০ জন নাসেরাত ও আতফাল হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সা.) ও প্রতিশ্রত মসিহ মাওউদ (আ.) বর্ণিত আল্লাহর গুনকীর্তন ও সকলের তরে ভালবাসার পংতি আবৃত্তি করে শুনান। ত্রিনিদাদ ও টোবাগো জামাতের আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ মওলানা ইব্রাহিম বিন ইযাকুব সাহেব প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ২১ শতকের ইসলামের পুনর্জীবন বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন যা উপস্থিত সকলে বিশেষ প্রশংসা করেন। জলসার প্রধান আকর্ষণ ছিল আমীর সাহেবের পাঠকৃত বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৫ম খলীফা হযরত মীর্যা মাসরুর আহমদ (আই.)-এর পাঠানো বিশেষ বার্তা, যা শনি ও রবিবার পড়ে শোনানো হয়। বার্তায় হুযূর বলেন, মহান আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের এই জলসা সব দিক থেকে সাফল্য মন্ডিত করুন, এই অনন্য ধর্মীয় সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী সকলে আধ্যাত্মিক ভাবে পুনর্জীবিত হন ও আল্লাহর বিশেষ রহমত আপনাদের ওপর বর্ষিত হোক। হুযূর বলেন, আমি দোয়া করি জামাতের সব আহমদীর মাঝে আরো বেশী তাকওয়া ও আধ্যাতিকতার উন্নতি হোক।

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাঠকদের অংশগ্রহণে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে 'পাঠক কলাম'। আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

"আত্মসংশোধনে হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবার প্রভাব।"

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ১৫ জানুয়ারি, ২০১৬-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে পরবর্তী আরো এক সংখ্যার পাঠক কলামের বিষয় নিম্নে দেওয়া হল।

১। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের গুরুত্ব।

*** আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।**

*** লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।**

*** লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।**

বিঃ দ্রঃ পাঠকরা যদি কোন বিষয় নিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে পাঠক কলামে লিখতে চান তাও পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

ন্যাশনাল সেক্রেটারী, ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ২ অক্টোবর, ২০১৫ ইং, রোজ শুক্রবার লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে জুমুআর খুতবায় নিম্নোক্ত তিনটি দোয়া বেশি বেশি পড়ার প্রতি জামা'তের সকল সদস্যকে নসীহত প্রদান করেন।

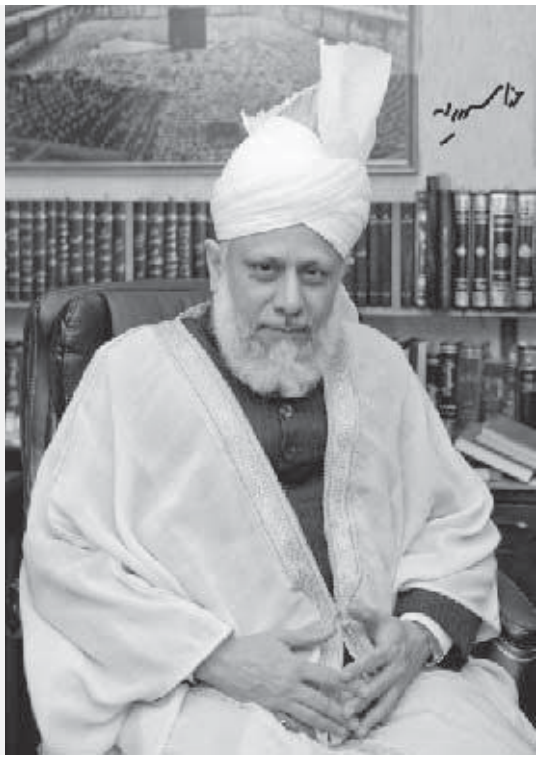

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

"রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নার।"

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়াতে এবং পরকালে যাবতীয় মঙ্গল দান কর এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

*** এছাড়া হুযূর (আই.) ইস্তেগফার করার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন।**

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّ اَتُوْبُ اِلَيْهِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ : আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ
رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী।"

অর্থ : হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএব, হে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ
وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ : হে আমার আল্লাহ্! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536
H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 78 | 11th Issue

The Ahmadi

Fortnightly

15th December, 2015 Tk. 20.00

Regd. No. D. A.-12

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমুত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্তোরা®

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"দিল মেঁ য়্যাহী হ্যা হার্‌দাম তেরা সাহীফা চুমুঁ
কুরআঁ কে গিরদ্ ঘুমুঁ কা'বা মেরা য়্যাহী হ্যা"

আমার আন্তরিক বাসনা হলো, সর্বদা যেন তোমার কিতাব চুম্বন করি আর কুরআনের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করি; বস্তুত আমার কা'বা এটাই।

–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী উপলক্ষে বহু প্রতিক্ষিত শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে।

এটি ইতিহাস ও তথ্যের এক অতুলনীয় সন্নিবেশ। এতে হুযূর আকদাস (আই.)-এর শতবার্ষিকী উপলক্ষে ঐতিহাসিক ভাষণ এবং স্মরণিকার জন্য হুযূর আকদাসের বিশেষ বাণী রয়েছে।

এতে আরো রয়েছে, এই বাংলা এবং পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি থেকে পথচলার দুর্লভ ইতিহাস। রয়েছে বাংলাদেশের সকল মসজিদ ও মিশনের সচিত্র একটি সংগ্রহ। এছাড়াও এতে এমন কিছু তথ্য রয়েছে যা ইতিপূর্বে কখনও সামনে আসে নি। এতে রয়েছে, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এছাড়াও রয়েছে ঈমান উদ্দীপক ও ইতিহাস সম্বলিত অনেক প্রবন্ধ। দু'শত বত্রিশ পৃষ্ঠার এই স্মরণিকায় আরো এমন বিষয় রয়েছে যা সত্যিই সংগ্রহ করে রাখার মত। তাই যত শিঘ্র সম্ভব আপনার কপিটি বাংলাদেশের ইশায়াত বিভাগে যোগাযোগ করে সংগ্রহ করুন।

স্মরণিকাটির শুভেচ্ছা মূল্য ৩০০/- (তিন শত) টাকা। প্রয়োজনে : ০১৭৩৬ ১২৪৭০৪

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com